বাগেরহাট জেলা

তিনি ধুতি পরে থাকলেন

ঘটনাটি ঘটে বাগেরহাট জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে। এই গ্রামের প্রায় অর্ধেক লোক ছিল হিন্দু। তাই এখানে বেশ কিছু মন্দির রয়েছে। সবচেয়ে বড় মন্দিরটি ছিলো যে জায়গায় সেই স্থানের নাম হাটখোলা। এই মন্দিরের ঠাকুরের নাম বাদল ঠাকুর। তিনি ছিলেন খুবই ধর্মপরায়ণ। দেশের অবস্থা খারাপ হতে শুরু হলে তার পরিবারের সকলে এক এক করে ভারতে চলে যেতে লাগলো। কিন্তু দেশের মাটির মায়ার টানে তার আর যাওয়া হলো না। তিনি মন্দিরেই থেকে গেলেন। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে সকল হিন্দু পাঞ্জাবি, টুপি পরে নাম পাল্টিয়ে মুসলমান নাম রাখা শুরু করলো। সবাই কলেমা ও নামাজ শিখে ফেললেন। কিন্তু বাদল ঠাকুর এটা করলেন না। তিনি ধুতি পরে থাকলেন। যুদ্ধের মধ্যভাগে খান সেনারা বিষ্ণুপুর গ্রামে প্রবেশ করে। প্রথমেই দুজনকে পেয়ে তাদের কাছে কলেমা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তারা এটি না পারায় একজনকে জবাই করা হয় এবং অন্যজনকে গুলি করে মারা হয়। যেখানে এদের মারা হয় সেখানে বিকট শব্দ হয়। মন্দির ছিল সেখান থেকে কাছে। বাদল ঠাকুর তখন মন্দিরে অবস্থান করছিলেন। আমি ও আমার ছয় ছেলেমেয়ে এবং আশেপাশের মোট প্রায় বিশ জনের মতো একটি গর্তে অবস্থান করছিলাম। সেখানে আগে গর্ত খুঁড়ে উপরে চালের মতো খড়কুটা লতাপাতা দিয়ে ছাদ তৈরি করা ছিল। আমরাও বাদল ঠাকুরের শব্দ শুনতে পাই। বাদল ঠাকুর গুলির শব্দে ভীত হয়ে মন্দির থেকে বের হতেই খান সেনাদের চোখে পড়ে যায়। খানসেনারা তাকে বেয়নেট দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে ভুড়ি বের করে ফেলে। আমরা তখন তার আর্ত চিৎকার শুনছিলাম। অনেকে কেঁদে ফেলে। আমাদের তখন একটাই চিন্তা, ওরা কী আমাদের ধরে ফেলবে? এভাবে কিছু লোককে হত্যা করে খান সেনারা ওই দিনের মতো চলে যায়। তখন আমরা বের হয়ে দেখি বাদল ঠাকুর তখনও মারা যায়নি। তার পেট থেকে ভূড়ি বের হয়ে গেছে। তিনি তখনও ছটফট করছিলেন, তিনি বলছিলেন আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চলো। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মারা যান। এই হৃদয় বিদারক কথা মনে পড়লে চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়।

একবার আমার ছোট ছেলে ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। আমার ছোট ছেলে নূর মোহাম্মদের বয়স তখন দুই সপ্তাহ, আমরা বাড়ির কাজে ব্যস্ত, এমন সময় শুনতে পেলাম খান সেনারা আমাদের গ্রামে প্রবেশ করেছে। তখন আমরা খুব দ্রুত বাড়ি থেকে বের হলাম। আমাদের বাড়ি ছিল নদীর পাশে। আমার স্বামী আমাদের নিয়ে খুব দ্রুত নদী পার হয়। নদী পার হয়ে কিছুদূর যেতেই আমার স্বামী আমাকে বলল, ছোট ছেলে নূর কোথায়? আমি তখন বললাম বাড়ি এবং কাঁদতে শুরু করলাম। তিনি বললেন তোমরা যাত্রাপুর চলে যাও। আমি নূরকে নিয়ে আসছি। আমরা চলে গেলাম। আমার বড় ছেলে নজরুল মেজো ছেলে ইলিয়াস ও মেজো মেয়ে খুশি আমার সাথে ছিল। এদিকে আমার স্বামী যখন বাড়ি পৌঁছালো খান সেনারা তখনও এসে পারেনি। তিনি নূরকে কোলে নিয়ে দ্রুত নদী পার হতে লাগলেন। পাড়ে যেতেই খান সেনারা গুলি করলো। কানের কাছ দিয়ে গুলি চলে গেল। তিনি নূরকে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে এলেন। এভাবে আমার ছোট ছেলে নূর মোহাম্মদ বেঁচে যায়।

সূত্র : জ- ১১৪৯৯

সংগ্রহকারী
মো. তানভীর আহমেদ
বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
৯ম শ্রেণি, বিজ্ঞান শাখা, রোল: ৪১

বর্ণনাকারী
মনোয়ারা বেগম
গ্রাম: বিষ্ণুপুর, পোস্ট: চিরুলিয়া
জেলা: বাগেরহাট, বয়স: ৭৩ বছর

নবরত্ন সংহার দিবস

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ যুদ্ধ শুরুর পরে খানসেনারা বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে হানা দিতে থাকে। তাদের সহায়তা করে রাজাকার,আলবদর, আলশামস বাহিনী। এদেরই কবলে পতিত হয় আমাদের মোল্লারহাট থানার ৫নং গাওলা ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের ৯ জন শিক্ষক। আমার ঠাকুরমা বলেন, ১৩৭৮ সালের ১৯ ভাদ্র মঙ্গলবার নৌকাযোগে বেতন তোলার জন্য ফকিরহাট পোস্ট অফিসে উপস্থিত হয় এই ৯ জন শিক্ষক। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ওনারা খানসেনাদের সম্মুখে পড়ে যান। ওনাদের কাছে খান সেনারা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি মুসলমান না মালাউন? ৯ জনের ভিতর থেকে অমলবাবু নামে একজন শিক্ষক নেতৃত্ব দিয়ে বলেন আমরা মুসলমান। দেশীয় স্বাধীনতা-বিরোধীরা খানসেনাদের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তাদের কাছে কোরানের কয়েকটি আয়াত জিজ্ঞেস করে। শিক্ষকরা প্রকৃতপক্ষে কিছু বলতে পারেন না। তাই ওনাদের নৃশংসভাবে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

এই হত্যাকান্ডে আমাদের এলাকা মেরুদণ্ডবিহীন মানবদেহের আকার ধারণ করে। সবার মনে হতাশা, এখন আমাদের কী হবে? এই ৯ জন শিক্ষক মারা যাওয়ার পর এলাকার মুরুব্বিরা অমলবাবু কই? কেশব বাবু কই? অবিনয় বাবু কই? জগবন্ধু বাবু কই? বলে বলে জ্ঞান হারাতেন। এ কারণেই আমার ঠাকুরমা সুমতী বিশ্বাস এ ৯ জনের মৃত্যুকে নবরত্ন সংহার দিবস বলে আখ্যায়িত করছেন। এর পরেও আমরা দেশ ছেড়ে যাইনি। ভারতীয় মিত্র বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। স্বাধীন দেশের বয়স এখন ৩৭ বছর। আমার ঠাকুরমার বয়স প্রায় ৬২ বছর। ঠাকুরমা বলেন, দেশে যত শিক্ষার্থী আছে তারা সকলে মিলে স্বাধীন দেশকে সুন্দর করবে এবং তাদের কাজে সহায়তা দেবে।

সূত্র : জ-১১০০৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
অন্বেষা বিশ্বাস	**সুমতী বিশ্বাস**
চাঁদেরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বয়স: ৬২ বছর
৯ম শ্রেণি, রোল: ০১	সম্পর্ক: ঠাকুর মা
মোল্লারহাট, বাগেরহাট	

বাবা, না কেঁদে কলা খান

১৯৭১ এর যুদ্ধের সময় হিন্দুরা সীমান্ত পেরিয়ে যাচ্ছে ভারত, মুসলিমরা অনেকেই যায়নি। হিন্দুদের পরিত্যক্ত সম্পদ লুটে নিচ্ছিল কতিপয় লোক। আমাদের গ্রাম থেকে দূরে এক বিত্তশালী হিন্দু পরিবার পালিয়ে গেল ভারত। তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ যেমন: সুপারি, নারকেল, হাড়ি-পাতিল ইত্যাদি নেয়ার জন্য মানুষ তাদের বাড়ি ছেঁকে ধরলো। তখন আমার বিয়ে হয়নি। আমি ছিলাম ছোট্ট বালিকা। তাই আমি ও আমার ভাই ঠিক করলাম আমরাও সেই বাড়ি যাব। যদি কিছু পাই সেই আশায়। যথা সময়ে বাবা মার চোখ ফাঁকি দিয়ে গেলাম সেখানে। গিয়ে দেখি কত লোক ভিড় করেছে সেখানে, বিশেষ করে নিম্নবিত্ত লোকেরা। আমার ভাই তার লুঙ্গি ভরে সুপারি নিলো। হঠাৎ শুনি বন্দুক রাইফেলের গুলির শব্দ। আমার ভাই আমাকে বলল, তুই বাড়ি চলে যা, এই বলে পাশের খালে লাফিয়ে পড়ল অন্যান্য মানুষের মত। দেখলাম আমার ভাই খালে সাঁতারের সময় যেই মাথা তুলল তখনি আমার ভাইয়ের মাথার পাশ দিয়ে একটি বুলেট বেরিয়ে গেল। আমি ধরে নিলাম আমার ভাই মারা গেছে, আমি কাঁদতে লাগলাম। বন্দুক রাইফেল নিয়ে রাজাকাররা হানা দিয়েছিল লুটতরাজের জন্য সেই বাড়িতে। ঠিক তখনি দেখি দুজন তাগড়া জোয়ানকে হাত-পা বেঁধে নিয়ে এসেছে। তারপর রাজাকার প্রধান বলল, এদেরকে জবাই করা হবে। তখন দেখলাম দুজন লোক রামদা নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হলো। দেখলাম এক কোপে তাদের ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে ফেলল। মুণ্ডুহীন দেহগুলো ফোস ফোস করছিল। আমার ফ্রকে সেই রক্ত এসে লাগল। আমি ছিলাম ছোট বালিকা। তাই এই ভয়াবহতা আমার অনুভব হচ্ছিল না। রাজাকার প্রধান ছিলো আমার আত্মীয়, তাই আমাকে বলল, তুই এখানে কী করছিস? বাড়ি যা। তখন আমি একটি পাকা কলার কাঁদি দেখলাম, আমি বললাম এই কলা না নিয়ে আমি বাড়ি যাব না। রাজাকার আমাকে এই কলার কাঁদি দিয়েছিল।

বাড়ি গিয়ে বাবা-মাকে সমস্ত ঘটনা বললাম, বললাম ভাই মারা গেছে। তখন বাবা-মা খুব করে কাঁদলো। যেহেতু আমি এসব বুঝতাম না তাই আমার এতটা দুঃখ অনুভূত হলো না। পাকা কলা আচ্ছা করে খেয়ে একটা কলা বাবার কাছে নিয়ে বললাম, বাবা, না কেঁদে কলা খান। বাবা এমনিতে পুত্র শোকে কাতর, তারপর আমার এই কথা শুনে আমাকে লাথি মারলেন। আমি কাঁদলাম, খুব মন খারাপ করে বসে রইলাম। এরপর জানালা দিয়ে আমার নাম ধরে কে যেন ডাকলো। গিয়ে দেখি ভাই উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। বাবা-মাকে জানালাম। বাবা-মা আনন্দে কেঁদে ফেললেন। এরপর দেশ স্বাধীন হয়েছে, নানা ঘটনার মাধ্যমে। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন।

সূত্র : জ-১১৮৩০

সংগ্রহকারী
আবুল হাসনাত মামুন
মধুদিয়া ইচ্ছাময়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়
৭ম শ্রেণি, রোল: ০১
সদর, বাগেরহাট

বর্ণনাকারী
ফিরোজা বানু
সম্পর্ক: প্রতিবেশি

গ্রামটির নাম ইসলামগঞ্জ

আমার বাড়ি বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের একটি গ্রামে। গ্রামটির নাম ইসলামগঞ্জ। এটা বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার বাসতলি ইউনিয়নে অবস্থিত। এই গ্রামে মুসলমান এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। তাদের অবস্থান শান্তিপূর্ণ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা থেকে আমাদের গ্রামটি অত্যন্ত অস্থির হয়ে ওঠে। আমাদের গ্রামের কিছু মানুষ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীদের সাথে যোগাযোগ রাখত। তারা নিয়মিতভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে গ্রামের গোপন বিষয়গুলো পাচার করত। তারা পাকিস্তানি বাহিনীকে আমাদের গ্রামে নিয়ে

আসতো এবং মুক্তিবাহিনী ও অনান্য নিরীহ মানুষের বাড়িতে যেত এবং পাশবিক অত্যাচার চালাত, মানুষের ঘরবাড়ি লুট করত এবং আগুন জ্বালিয়ে দিত। তারা অনেক নিরীহ মানুষকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করত। মানুষ হত্যা করার জন্য এই ক্যাম্পে একজন নির্ধারিত রাজাকার ছিল তার নাম হামিদ জল্লাদ (ভ্যান হামিদ) (মৃত)। রামপাল এলাকার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন মাওলানা খাইলুল বাশার কুদরতি(জীবিত)। প্রধান কমান্ডার ছিল রজ্জব আলী (মৃত), ইউনিয়ন কমান্ডার ছিল সাজ্জাত হোসেন (মৃত)। এছাড়া তাদের সহকারী রাজাকাররা হল:

১) আলী আশরাফ শেখ (জীবিত)
২) রশিদ ফকির শেখ (জীবিত)
৩) জাফর বয়াতি (জীবিত)
৪) হায়দার (জীবিত)
৫) হামিদ কুদরতি (মৃত)
৬) মুহাম্মদ কুদরতি (মৃত)
৭) মসলেম ডাকুয়া (মৃত)
৮) করিম শেখ (মৃত), আরও অনেকে।

আমাদের এলাকায় দুজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ছিল যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে অস্ত্রসহ পালিয়ে আসে। তারা গ্রামের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার জন্য উৎসাহিত করে। সেই দুইজন মহান ব্যক্তির নাম:

১) হাসান আলী শেখ (জীবিত)
২) ইয়াকুব আলী শেখ (মৃত)

তারা যখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে গ্রামবাসীকে উৎসাহিত করতে ব্যস্ত তখন রাজাকারেরা পাকিস্তানি বাহিনীকে আমাদের গ্রামে নিয়ে আসে এবং দুই মহান মুক্তিযোদ্ধার বাড়িতে গিয়ে সকল সদস্যকে নির্মমভাবে অত্যাচার করে এবং বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। তখন গ্রামের অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যরা তাদেরকে গোপনে সহযোগিতা করে। আমাদের গ্রামে আর তিনজন বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধের সময় তাদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনজন মুক্তিযোদ্ধা হলেন-

১) টি ইউ আহম্মদ (মৃত)
২) শেখ নূর মুহাম্মদ (মৃত)
৩) আমজেদ আলী (মৃত)

নিজেদের জীবন বাজি রেখে তারা অনেকবার পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ করেছেন। ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম লেখা নেই। কিন্তু আমাদের গ্রামের সব মানুষের হৃদয়ে তারা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আমাদের গ্রামের পাশের গ্রামের নাম ডাকরা। এই গ্রামে ইতিহাসের এক জঘন্যতম ঘটনা ঘটে। ডাকরা বাজারে প্রায় ৩৫০০-৪০০০ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হয়েছিলো ভারতে চলে যাওয়ার জন্য। সাথে তাদের খাবার ছিলো না। ছিলো পথ খরচের সামান্য টাকা। তাদের মধ্যে ছিল নারী, শিশু, পুরুষ এবং যুদ্ধের শিকারে কবলিত অনেক অসুস্থ মানুষ। ইতিমধ্যে ডাকরার স্থানীয় দুই রাজাকার তাদের নাম-

১) লিয়াকত (মৃত)
২) আলতাফ (মৃত)

বাগেরহাট এলাকার কুখ্যাত রাজাকার রজব আলী ফকিরকে তারা খবর দেয়। তাদের একত্রিত হওয়ার খবর পেয়ে বাগেরহাটের রাজাকার রজব আলী ফকির, কেরামত গোলদার এবং আরও অনেক রাজাকার লঞ্চ নিয়ে বেলা ১২:০০ টার দিকে ডাকরা বাজারে আসে। এসেই তারা নারী ও শিশুদের সামনে শুধু পুরুষদের গুলি করে হত্যা করে। সেদিন ডাকরা নদীতে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়। সমস্ত নদী লাল বর্ণ ধারণ করে। নারী ও শিশুদের

আহাজারিতে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। বহু দিন পর্যন্ত সেখানে ছিল লাশের স্তুপ আর বাতাসে ছিল গন্ধ। তারা শুধু মানুষ হত্যা করেনি, শিশু ও নারীদের উপর চালিয়েছে অমানবিক নির্যাতন।

এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, কুখ্যাত রাজাকার ও জল্লাদ হামিদের বাড়ি আমাদের বাড়ির সীমানায়। সে ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর, বর্বর এবং অত্যাচারী। প্রতিবেশীদের সাথে তার কোন সদ্ভাব ছিল না। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময় সে বহু মানুষকে নিজ হাতে জবাই করেছে। এই কারণে তার নামের সাথে জল্লাদ যোগ না করলে কেউ তাকে চিনতে পারে না। যুদ্ধের সময় সে ব্যক্তিগত শত্রুতাবশ্যত অনেককে হত্যা করে। রামপাল থানার রাজাকাররা যেসব মুক্তিযোদ্ধা ও নিরীহ মানুষদের বন্দি করে আনত হামিদ একাই তাদেরকে হত্যা করত। তার মনে সামান্য দয়া মায়া বা সংকোচ ছিল না। সে নাকি পায়ে নূপুর পরে নাচতে নাচতে সবাইকে হত্যা করত হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। এরকম নিষ্ঠুর অত্যাচার কে কখন দেখেছে?

আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এই ধারণা যে, প্রত্যেক রাজাকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মানুষের উপর যে অত্যাচার করেছে এখনো তাদের যে কালো থাবা আমাদের সমাজকে আঁকড়ে ধরে আছে তা ইতিহাসে নজিরবিহীন। সেই একাত্তরের কথা মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করলে এখনো তারা ভয়ে আঁতকে ওঠে। আমি মনে করি আল্লাহ তাদের অপকর্মের জন্য যথার্থ শাস্তি দিবেন, কারণ মানুষের শাস্তি যতই বড় হোক না কেন তা আলাহর শাস্তির কাছে অতিক্ষুদ্র।

সূত্র : জ-১১৫৮৯

সংগ্রহকারী
অচিন্ত্য বিশ্বাস
সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়
৮ম শ্রেণি, রোল: ৮৩২৮
মোংলা, বাগেরহাট

বর্ণনাকারী
হীরক চন্দ্র বিশ্বাস
বয়স: ৫৫, সম্পর্ক: পিতা

একটু নড়লো না

১৯৭১ সালে সারা বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রমনা রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চের ভাষণ সমগ্র বাঙালিদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি আমার এই ভাষণকে স্বাধীনতার ঘোষণা বলে মেনে নিয়ে পশ্চিমা হানাদারদের নির্মূল করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবে। এরপর শুরু হয় স্বাধীনতার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে স্বেচ্ছায় অংশ নেয় বাংলার দামাল ছেলেরা, মেয়েরা। চলে দীর্ঘ নয়টি মাস গেরিলা যুদ্ধ। এই গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেন ভারতের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এম এ রাজ্জাক যিনি তার দুঃসাহসিক গেরিলা যুদ্ধের বিষয়ে খুলনা বেতারে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন এবং তার এই সাক্ষাৎকার বেতার থেকে ৬/৭ বার প্রচার করে মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার নামক অনুষ্ঠানে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে খান সেনারা জোর করে পশ্চিম পাকিস্তানে ধরে নিয়ে যায়। এরপর শুরু হলো তার ৭ মার্চের ঘোষণা অনুযায়ী মুক্তির সংগ্রাম। আমার বড় চাচা তখন ছাত্রলীগের সভাপতি। পাঁচগাও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির ছাত্র। এদেশের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নানা স্থানে নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে লাগলেন আমাদের নিজ এলাকা থেকে। প্রত্যেক লোকেরই চোখে মুখে যেন একটা চরম উদ্বেগের ছাপ। বিশেষ করে বেশি হতাশা দেখা দিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। কখন যেন কি ঘটে যায়। দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে সকলের দিন কাটতে লাগলো। হঠাৎ করে বড় চাচা শুনতে পেলেন বাগেরহাট থেকে কুখ্যাত রজ্জব আলী ও আকিজ উদ্দিন বিরাট রাজাকার বাহিনী আমাদের পাশ গ্রাম লক্ষীখালি বিখ্যাত গোপাল সাধুর বাড়িতে আক্রমণ চালাবে। বাড়ির তিন দিক থেকে ঘিরে বাড়ির ভিতর প্রবেশকালে বড় চাচা ছোট চাচাসহ আরো অন্যান্য লোক বাড়ির পূর্বদিক থেকে ওদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা

করে। ওদের কাছে বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র থাকায় বড় চাচার দলবল বেশি সময় থাকতে পারলেন না। তারপর বাড়ির মধ্যে হানাদাররা প্রবেশ করে প্রথমে লুটপাট চালায় ও লোকজনদের হত্যা করে। পরে প্রত্যেকটা ঘরে অগ্নিসংযোগ করে দিল। ঘরগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো। তার মধ্যে ওরা উল্লাসের সাথে নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে। সাধুবাড়িসহ ঐ এলাকার প্রায় অর্ধশত মানুষকে তারা হত্যা করলো। তার মধ্যে উল্লেখ্য, এক মতুয়া গোঁসাই সাধুর ছবিটিকে প্রণাম করা অবস্থায় হানাদার বাহিনী তার পিঠের দিক হতে লম্বা এক ছোরা এপিঠ ওপিঠ করে দিলো। কিন্তু অবাক ব্যাপার ঐ গোঁসাই একই অবস্থায় পড়ে থাকলো, একটু নড়লো না। স্থানটি আজও আছে। হানাদার চলে যাবার পর মৃতদের সাধ্যমতো সৎকার এবং যারা কোন রকমে বেঁচে থাকলো বড় চাচা তার দলবল নিয়ে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। এরমধ্যে সাধু বাড়ির উত্তর পূর্বদিকে ২০/২৫টি পরিবারের বসত বাড়িতে ঢুকে অনুরূপ লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন এবং হত্যা করে যাবার সময় প্রায় ২/৩টি যুবতী কুমারী মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়, যাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের সময় একটি ৮/১০ বছরের ছেলেকে এমনভাবে কোপ দিয়েছে ছেলেটার নাড়িভুড়ি সব ঝুলে পড়ে। মরার মত ঘরের এক কোনে প্রায় তিন দিনের মত পড়ে থাকে। পোড়া ঘর দেখার জন্য ও অন্যান্য খোঁজ খবর নেবার জন্য বড় চাচা ঐ এলাকায় গেলে আহত অবস্থায় ঐ ছেলেটির সন্ধান পান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ভারতে পাঠানো হয়। সেই ছেলেটি আজও বেঁচে আছে। এরই সাথে আহত আরেকজনকেও ভারতে পাঠানো হয়েছিল। আহতদের মধ্যে এ দুজনার অবস্থা দেখে বড় চাচা প্রতিজ্ঞা করেন, জীবন দিয়ে হলেও হায়েনাদের কাছ থেকে দেশকে স্বাধীন করবোই ইনশাহ আল্লাহ।

তারপর এলাকার কয়েকজনকে নিয়ে ভারতের বিহারে ট্রেনিং শেষে এসে নানা জায়গায় হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন হবে হবে এমন সময় বড় চাচা খুঁজতে লাগলো সেই রাজ্জব আলী এবং জল্লাদ আকিজুদ্দিনকে। তারা যখন বাগেরহাট সশস্ত্র অবস্থায় লঞ্চ নিয়ে আসলো ততক্ষণে অনেক কিছুই শেষ হয়ে গেছে। রজ্জবালী স্বাধীন বাংলাদেশ দেখবে না বলে হাতের হিরার আংটি মুখে দিয়ে চুষে বাগানের মধ্যে গিয়ে আত্মহত্যা করে।

এই কুখ্যাত রজ্জবালী ও আকিজদ্দিনের আরও দোসর ছিল। জল্লাদ হিসেবে আমাদের এলাকায় আজও পরিচিত মোসলেম ফরাজী। রাজাকার, আলবদর ও খান সেনাদের ধৃত নিরীহ লোকদের সে ক্যাম্প থেকে নিয়ে যেত মোরেলগঞ্জ বাজারের নদীর পাড়ের পন্টুনে। সেখানে দাঁড় করিয়ে এক জনের গলায় এক এক পোচ দিত ধারালো ছোরা দিয়ে । তারপর লাথি মেরে নদীতে ফেলে দিত। এইভাবে সবাইকে জবাই করার পর শেষ জনের মাথা কেটে চুল ধরে উল্লাস করতে করতে বাজারের মধ্যে নিয়ে সবাইকে দেখাত। এভাবে সাধারণ মানুষকে মুক্তিযোদ্ধা বলে ধরে এনে নানাভাবে অত্যাচার ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যার পর উল্লাস করতো। এদের অপরাধ এরা নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যকারী। নরপিশাচের দল রাজাকার আলবদর খান সেনারা তাদের ক্যাম্পে এলাকা থেকে মহিলাদের ধরে এনে অমানুষিকভাবে নির্যাতন চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে খাল বিলে ফেলে দিত। সেসব লাশ শিয়াল কুকুরে খেত। বিনিময়ে রাজকাররা পেত খান সেনাদের কাছ থেকে বকশিস। এই নির্মম পিশাচের দল আজও স্বাধীন বাংলার মাটিতে দম্ভভরে জীবনযাপন করছে। আর স্বাধীনতার সূর্য সৈনিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে, অথচ এদের কোন বিচার হচ্ছে না। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সোনার ছেলেরা আজ যেখানে সেখানে বেইজ্জত হচ্ছে। অসহায় হয়ে দ্বারে দ্বারে অনেকে ভিক্ষা করছে। আজ তাদের চরম দৈন্য দশা।

হানাদারদের হত্যাযজ্ঞ চলাকালে মোংলায় তিন জন ধরা পড়ে। এদেরকে একসঙ্গে পুলের উপরে দাঁড় করিয়ে গুলি করে। দুই জন পানিতে তলিয়ে গেলেও মো: আব্দুল কুদ্দুস হাত পা বাঁধা অবস্থায় ভাসতে ভাসতে চরে গিয়ে ওঠে। পরে স্থানীয় জনগণ দেখে গোপনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। বর্তমানে আ. কুদ্দুস মোংলা থানা কমান্ডের সদস্য। তার গুলি লেগেছিল গলার এক পার্শ্বে। খান সেনারা স্থানীয় রাজাকারদের কাছে সুন্দরী লাড়কি চাইতো। আর লাড়কি যোগাড় করে দিতে না পারলে অনেক রাজাকারকে গুলি করে মেরে ফেলত। এ ধরনের অনেক প্রমাণ রয়েছে। কালে খার বেড় এলাকায় ভীষণ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে খান সেনা, রাজাকার, বিহারী, মিলিশিয়া অনেক

হানাদার আহত হয়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা ছিল মাত্র ৮০ জনের মত। তিন দিক দিয়ে ঘিরে ওরা যুদ্ধ করে। বহু হানাদার এ যুদ্ধে আহত হয়ে অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেলে রেখে চলে যায়। পরে ঐ এলাকা থেকে পিস কমিটির লিডার হাদি মল্লিককে ধরা হয় এবং কয়েকদিন ক্যাম্পে রাখার পর তার কাছ থেকে নানা তথ্য জানার পর তাকে মেরে ফেলা হয়।

সূত্র : জ-১১৬৩১

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
আশিকুর রহমান	**ডা. এম এ রাজ্জাক**
সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: কেওড়াতলা, পোস্ট: মোংলা
ষষ্ঠ শ্রেণি	থানা + জেলা: বাগেরহাট
মোংলা, বাগেরহাট	বয়স: ৫৫ বছর, সম্পর্ক: পিতা

সবাই আত্মসমর্পণ করো

আমার সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ কালের সব থেকে স্মরণীয় ঘটনা যা মনে হলে নিজেকে পাগল বলে মনে হয় আবার সেই দুঃসাহসিকতার কথা ভেবে বুক গর্বে ভরে যায়। কোথায় ১৫০ জন সশস্ত্র রাজাকার আর আমরা মাত্র দুজন।

আমার যতদূর মনে পড়ে ১৬ ডিসেম্বরের সপ্তাহ খানেক আগে রামপাল থানা অধিকার করেছিলাম। রামপাল থানা পুলিশের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হেফাজতে। জলিল ভাই আমাদের লিডার। তার নেতৃত্বে আমরা একাজ করেছিলাম। সেজো ভাই ও ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার বাহিনীর হাতে আটকা পড়েছে। আজ রাত্রেই তাদের গুলি করে মারা হবে। জলিল ভাই আমাকে ডেকে বললেন, সংবাদ শুনেছি, এখন কী করা যায়? উত্তরে আমি বললাম, আদেশ করুন। সন্ধ্যার সময় বললেন, তুমি আর টি আহম্মদ যাও। টি আহম্মেদের বাড়ি ছিল ইসলামাবাদের পাশে। গ্রাম বড়দিয়া। বাঁশতলা ইউনিয়নের অন্তর্গত রামপাল উপজেলার অধীনে। এর আগে এইভাবে টি আহম্মদকে নিয়ে কোন অপারেশনে যাওয়া হয়নি তাই। যা হয়, চিন্তা ভাবনা নেই, যেদিন থেকে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার চিন্তা করেছি সেই দিন থেকে ভেবে নিয়েছিলাম যে কোনো মুহূর্তে একটি বুলেট আমাকে ভেদ করে চলে যেতে পারে। আমি ট্রেনিং পেয়েছিলাম ভারতের, দেরাদুন সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে। সেখানে আমাদের সশস্ত্র গেরিলা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এক মাস। নীতি ছিল গেরিলাদের "আমরা মারব কিন্তু মরব না"। আমরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে লোক নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ দিয়ে শত শত মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করব।

ঠিক করলাম মুখোমুখি যুদ্ধে যাব না। বাকযুদ্ধ দিয়ে রাজাকার বাহিনীকে পরাস্ত করতে হবে। সেই মত দুই জন পরিকল্পনা করলাম। দুজনে একটি হ্যান্ড মাইক জোগাড় করে নিলাম। আর ট্রেনিং শেষে ভারতীয় সেনা ক্যাম্প বারাকপুর থেকে পাওয়া এস আই আর ১০ ম্যাগজিন গুলি, ৫টি গ্রেনেড, একটি এন্টিপার্সোনাল মাইন, একটি বুবিট্রাপ এবং একটি চাকু নিলাম। হেভারস্যাকটি পিঠে বেঁধে এস আই আর-টি কাঁধে নিয়ে জলিল ভাই ও মেজো ভাইকে বিদায় জানিয়ে টি আহম্মদকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যার পর রামপাল ঘাটের থেকে নৌকায় করে বড়দিয়া গ্রামে এসে নামলাম। ওর পথ-ঘাট ভালই চেনা, বিলের মধ্য দিয়ে এসে উঠলাম ইসলামাবাদ গ্রামে। ইসলামাবাদ বলে পূর্বে কোন গ্রাম ছিল না। আসল নাম "কিসমত চাউতিলা", মাদ্রাসাটির নাম দেওয়া হয় ইসলামাবাদ মাদ্রাসা, সেখান থেকে ইসলামাবাদ বলে পরিচিত হতে থাকে। এই মাদ্রাসার উত্তর পশ্চিম পাশে খাইরুল মওলানার বাড়ি। তিনি বাঁশতলা ইউনিয়নের শান্তি কমিটির সভাপতি, ইউনিয়নবাসীর কর্তা। তার কথায় তখন

একটা মানুষের বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়া নির্ভর করত। তার বাড়িতে রাজাকার ক্যাম্প। ১৫০ জন রাজাকার সেখানে খাওয়া-দাওয়া সারছে। তারপরে সেই ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধার বিষয় নিষ্পত্তি হবে। এরা এই ১০০ জন মূলত মুক্তিযোদ্ধা নয়। তারা ছিল পাশাপাশি গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। ইউনিয়নের মধ্যে যেখানে যে কয়জন আছে তাদের খোঁজ-খবর করে এখানে আনা হয়েছিল। তাদের সঙ্গে ইচ্ছামতো রসিকতা করে তাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে এই ছিল উদ্দেশ্য।

মাদ্রাসার পশ্চিম পাশ দিয়ে একটি রাস্তা বড় রাস্তা থেকে নেমে গেছে, এরই কাছাকাছি খাইরুল মওলানার বাড়ি। আমি এই রাস্তার মুখে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে হ্যান্ড মাইক দিয়ে মাইকিং করতে লাগলাম। তোমরা রাজাকার যারা আছ সবাই আত্মসমর্পণ করো, নতুবা তোমাদের কারো নিস্তার নেই। আমরা তোমাদেরকে ঘিরে ফেলেছি। এইভাবে তিন/চারবার বললাম। আহম্মদকে বললাম, দেখ রাস্তা দিয়ে কেউ আমাদের দিকে আসে কি না। আমাদের কেউ অনুসরণ করে কিনা। কিন্তু মানুষের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। রাস্তার অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। আমি আবার একই মাইকিং করলাম। প্রতি উত্তরে কোন কিছুই পাওয়া গেল না।

আহম্মদকে মাদ্রাসার পূর্ব দিকের রাস্তাটা দেখতে বলেছিলাম। প্রায় আধা ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হয়ে গেল। কোনো সাড়া শব্দ নেই। হঠাৎ আহম্মদ একটা গুলি করল। প্রায় পাঁচ রশি দূরে একটি গরু বিকট শব্দ করে ডেকে উঠল। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। ওকে আর আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি এই পথ ভালো চিনি না। ভাবছি কী করে আমি এখন ফিরে যাব? এখন যদি রাজাকাররা কেউ এসে আমাকে বেড় দিয়ে ফেলে তখন কী করে যাব? কী বলব?

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ওর কোনো সন্ধান না পেয়ে আস্তে আস্তে বিলে নেমে বড়দিয়া চলে এলাম। সেখান থেকে এই রাত্রে নদী সাঁতরে রামপাল চলে এসে জলিল ভাইকে সব বললাম। সকালে আহম্মদকে খুঁজে নিয়ে শাস্তি দেওয়া হলো এইরূপ অসঙ্গত আচরণের জন্য। যে ১৫০ জন রাজাকার ছিল তারা ভয়ে ওই রাত্রে বিলে ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে চাকশ্রী হয়ে বাগেরহাট ক্যাম্পের উদ্দেশে চলে গেল। আর আটক ১০০ মুক্তিযোদ্ধা বিনাশ্রমে মুক্ত হয়ে গেল।

সূত্র : জ-১১৫০০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
পুষ্পেন্দু ডাকুয়া	**বনমালা ডাকুয়া**
বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: সুন্দরপুর, পোস্ট: রামপাল
৯ম শ্রেণি, রোল: ৬০	জেলা: বাগেরহাট
	বয়স: ৬৯ বছর

লাশ উঠাবার অনুমতি দিল

একদিন পাক আর্মি আমাদের বাড়ির চারপাশ ঘিরে ফেলল। সবাই তখন বিছানায় গেলেও কেউ ঘুমায় নাই। সবাই প্রদীপ নিভিয়ে মশারির ভিতর বসে আছে। আমার দাদি টের পেল গাড়ির শব্দ। বাড়ির চারপাশ ঘিরে ফেলল আর্মিরা। আর্মিরা প্রতিটি ঘরে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। আর বলল, 'জোয়ান লারকা আছে' অর্থাৎ যুবক ছেলেরা আছে? দরজা খুলে দিলে তারা প্রথমেই পেল দুইতিনজনকে। ওই ঘরে আমার এক দাদা ছিলেন মোতালেব হাওলাদার। আমার দুই চাচা ছিল। একজন আলতাফ সরদার, বাড়ি সাতসিকে। আর একজন ছিল দেলোয়ার সরদার। এই তিনজন ছিল গেরিলা যোদ্ধা। এদের তিনজনকে গাড়িতে চোখ বেঁধে নিয়ে গেল বাড়ি থেকে। এরপর ওরা এসে প্রতিটি ঘর সার্চ করতে লাগল। আমার এক দাদু ছিল, তাকে তারা ধরে নিয়ে গেল

তাদের গাড়ির কাছে। কিছু সময় পরে সে বাড়িতে চলে এল। আমার দাদিরা সবাই তার কাছে গেল এবং জিজ্ঞাসা করল কোথায় তারা? সে জবাব দিল দড়াটানা ঘাটে নিয়ে গেল।

তারপর কিছু সময় পর ছয়টা গুলির শব্দ হলো। রাত তখন তিন ঘটিকা। ওই সময়ে আমাদের বাড়িতে কান্নাকাটি চেঁচামেচি আরম্ভ হয়ে গেল। সবাই এদিক ওদিক চলে গেল। পুরুষ লোকেরা যারা ছিল তারা বাইরে চলে গেল। পরের দিন অর্থাৎ ৩১ আগস্ট ভোর পাঁচটা, আমার দাদিরা সেদিন কোন লোকের কাছে শুনল দড়াটানা ঘাটে তিনজনের লাশ ভাসতেছে। তারপর আমার দাদারা বহু লোকজন নিয়ে রজ্জব আলী ফকিরের কাছে আর সুন্দর আলীর কাছে গেল অনুমতি আনার জন্য যে লাশ উঠাবে। এই দুইজন রাজাকার ছিল এবং শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিল। তখন সকাল সাড়ে ছয়টা। রজ্জব আলী লাশ উঠাবার অনুমতি দিল। তারপর দশ ঘটিকায় এরা লাশ উঠায়ে গাড়িতে করে বাড়ি নিয়ে আসল। আমাদের বাড়ি সবাই আসল এবং দেখল । আমাদের দোষ ছিল আমরা আওয়ামী লীগ ছিলাম।

সূত্র : জ-১১৫২১

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সাদমান নওরাত জয়	**জাহানারা সিদ্দিকী**
বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স: ৬৯ বছর
৬ষ্ঠ শ্রেণি, ক শাখা, রোল: ৫৫	সম্পর্ক: দাদি

মন্দিরকে মসজিদ বলত

আমার নানা বলেছেন মোংলা উপজেলায় যুদ্ধ শুরু হয় এপ্রিল মে-র দিকে। তার কয়েকদিন পরে মোংলা বন্দরে আনা যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম বন্দুক, গোলাবারুদ ইত্যাদি লুট করে নিয়ে আসে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা। তারা বড় লোহার পাইপ দিয়ে কামান তৈরি করে পশুর নদীতে পরীক্ষা চালায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাইপটি ফেটে যায়। এর মধ্যে পাকিস্তানি দুটি নৌ যুদ্ধজাহাজ জাহাঙ্গীর ও মনোয়ারা মোংলা বন্দরে এসে গুলিবর্ষণ করে এবং নিরীহ মোংলাবাসীদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। তারা এখানে অনেক মানুষকে হত্যা করে এবং অনেক হোটেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এসময় এদেশের লোক অনেকেই ভারতে চলে যায়। তারা সঙ্গে কিছুই নিতে পারে না। যার যা সঙ্গে ছিল সব ফেলে ভারতে আশ্রয় নেয়। আমার নানা ভারতে যাননি। তারা এদেশেই ছিলেন। এদেশে তাদের অনেক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনী আসতে লাগলে তারা ধানের খেতের মধ্যে গিয়ে পালিয়েছেন। আগস্ট মাসের দিকে মুক্তিবাহিনীরা একটি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। আমার নানাদের ওখানে সবাই মুসলমান হয়েছিল, পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে বাঁচার জন্য। তাদের মেয়ে অন্যরা নেবে বলে তারা বিয়ে করে ফেলেছিল। আমার নানারও তখন বিয়ে হয়। তাদের দিন চলত কষ্টে। পরে অবশ্য তারা আবার হিন্দু হয়ে যায়। তারা নিজেদের মন্দিরকে মসজিদ বলত। নামাজ পড়ার নামে তারা পূজা করত। তারা রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে পূজা করত। রাত দুপুরে পাকিস্তানি বাহিনী এলে তারা লুকাতো ধান ক্ষেতে এবং পাকিস্তানি বাহিনী যখন চলে যেত তখন তারা ঘরে ফিরে আসত।

একদিন আমার নানা বাজারে গিয়েছিলেন। তখন সেখানে পাকিস্তানি বাহিনী এসে পড়ে এবং আমার নানাকে সহ অনেক মানুষ ধরে নিয়ে যায়। অতঃপর তাদের লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে গুলি শুরু করে। আমার নানা আগে থেকে মাটিতে শুয়ে পড়েছিলেন, সেজন্য তিনি বেঁচে যান। তারপর তিনি অতি কষ্টে বাড়ি আসেন। তারপর মিত্র বাহিনী এসে বোমাবর্ষণ করে অনেক জাহাজ ডুবিয়ে দেয় এবং অনেক গাড়ি ভেঙ্গে দেয়। একদিন পাকিস্তানিদের একটি যুদ্ধের ট্রাক মুক্তিবাহিনীরা ঠেলে নিয়ে আসছিল, তখন উপর থেকে মিত্র বাহিনী এটি পাকিস্তানি ট্রাক

ভেবে বোমা ফেলে এবং ট্রাকটি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ১৬ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর অতর্কিত হামলায় পাকিস্তানি বাহিনী ভীত হয়ে আত্মসমর্পণ করে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

সূত্র : জ-১১৬১৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
অমিত মণ্ডল	**সুশীল বিশ্বাস**
সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: ব্রাহ্মণের মেঠ, পোস্ট: মিঠাখালী
৭ম শ্রেণি, রোল: ৭৪০৪	থানা: মোংলা, জেলা: বাগেরহাট
মোংলা, বাগেরহাট	বয়স: ৭০ বছর, সম্পর্ক: নানা

আল্লাহ তোমার কি কোন বিচার নেই

মোংলা বন্দরে পাকিস্তানের হানাদারদের আক্রমণ করার একটি নির্মম ঘটনা-

পাকিস্তানিদের আক্রমণের সময় সেখানকার রাজাকার ছিল হাসেম গাজী। সে ছিল এমন নিকৃষ্ট যা জানোয়ার বা পশুর মত। তারই ছেলে হুমায়ূন। সেখানকার শ্রমিকের মেয়ে ছিল খোদেজা, শ্রমিকের নাম ছিল ইদ্রিস। তারই মেয়ের নির্মম কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হলো-

গভীর রাতে ইদ্রিসদের বাড়িতে গিয়ে তার মেয়ে খোদেজাকে তুলে আনে রাজাকারের ছেলে হুমায়ূন। তারপর মোংলা বন্দরের পশুর নদীর তীরে সিগন্যাল টাওয়ারের ঐখানে এনে পাকিস্তানি হানাদারদের কাছে তুলে দেয় এবং হানাদারা নির্মমভাবে খোদেজাকে ইজ্জত নষ্ট করে হত্যা করে। খোদেজার করুণ কণ্ঠের আর্তচিৎকারের কথা খুবই কষ্টদায়ক। গলায় ছুরি দিয়ে এবং বিভিন্ন স্থানে ক্ষতবিক্ষত করে হত্যা করে পশুর নদীর একটু দক্ষিণ দিকে বিবস্ত্র অবস্থায় খোদেজাকে ফেলে দেওয়া হয়। অসহায় অবস্থায় পড়ে রইল খোদেজার ক্ষত-বিক্ষত দেহ।

পরদিন তার বাবা-মা তাকে খুঁজতে লাগলো, কিন্তু কোথায় পাবে তার হারিয়ে যাওয়া মেয়ে খোদেজাকে। কিছুদিন পর তারা খোঁজ পেলো, কিন্তু সে আর বেঁচে নেই। তার মর্মান্তিক অবস্থা দেখে তার মা চিৎকার করে আল্লাহর কাছে বললো, আল্লাহ তোমার কি কোন বিচার নেই। তার মায়ের হাহাকার কান্নায় সে পাগল হয়ে গেলো এবং তার বাবা তার মেয়ের জন্য প্রতিবাদ করাতে পাকিস্তানি হানাদারা তাকেও হত্যা করল।

সূত্র : জ-১১৬১৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সাদিয়া ইয়াসমিন কেয়া	**মোকলেস রহমান**
সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়	পূর্ব মনিপুর, ১১৪৮নং
৭ম শ্রেণি, রোল: ৭১২৭	মিরপুর ১০, ঢাকা
মোংলা, বাগেরহাট	

আপনার কোন ভয় নেই

আমার নানা মো. মিজানুর তালুকদার। তখন তার বয়স ২৫/২৬ বছর, বিয়ে হয় যুদ্ধের এক মাস আগে। যুদ্ধ শুরু হয় ২৫ মার্চ রাতে। আমার নানা তখন তার শ্বশুরবাড়ি। তখন তারা সবাই দিনের খাটুনিতে রাত্রে ঘুমে

মশগুল। রাত তখন গভীর। তারা সবাই তখন হঠাৎ জেগে ওঠে গুলির শব্দে। সবাই ঘুম থেকে কাঁপতে কাঁপতে ওঠে। ভয়ে সবার মুখ শুকিয়ে গেছে। কে কোথায় যাবে, সবাই দিশেহারা। এদিক ওদিকে কান্নাকাটির রোল। সে এক করুণ দৃশ্য। দেখে আমার নানা চিন্তা করে যে, এদের হাত থেকে তারা কি করে বাঁচবে, তার পরিবার পরিজন কিভাবে বাঁচবে! হঠাৎ তার খেয়াল হলো যে আগে মাতৃভূমি বাঁচাতে হবে তারপর পরিবার পরিজন বাঁচাতে হবে।

আমার নানাকে পিরোজপুর থানার হুলারহাট লঞ্চঘাটে পাক সেনারা ধরে কালিমা পড়তে বলে। তখন সে খুব ভয় পেয়ে যায়। তখন কালিমা পড়তে ভুল করে। পাক বাহিনী আমার নানার উপর অনেক অত্যাচার করে এবং গুলি করতে চায়। তখন এক বাঙালি পুলিশ পাক বাহিনীকে বুঝিয়ে বলে যে, সে মুসলিম। সেই পুলিশ আমার নানাকে আস্তে আস্তে কালিমা পড়ায় আর আমার নানা তা পাক বাহিনীকে শুনায়। তারপর আমার নানা পাকবাহিনীর কাছ থেকে কোনরকমে পালিয়ে আসে শ্বশুরবাড়ি কাউখালী হোগলা বেতকা গ্রামে। তার শ্বশুর বাড়ি আসার পর তার সাথে এক রাজাকারের প্রচন্ড গন্ডগোল হয়। তারপর রাত্রে আমার নানাকে আটক করে এবং খুব অত্যাচার করে। সেখান থেকে আমার নানা কোন রকমে পালিয়ে আসে এবং খুলনার উদ্দেশে রওনা হয়ে যায় পায়ে হেঁটে। তখন সে চলে যায় বাগেরহাট জেলার দেপাড়া গ্রামে। সেখানে যেয়ে আমার নানা দেখে যে, মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল গড়ে উঠেছে। তারা দলে ৭/৮ জন ছিল। তাদের কাছে আমার নানা জিজ্ঞেস করে খুলনা যাব কোন পথে? তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। তারা জিজ্ঞাসা করে কেন খুলনা যাবেন আপনি? আমার নানা প্রথমে তাদের কাছে কোন কথাই বলতে চায় না, এমনকি তার নিজের ঠিকানাটাও দিতে চায় না ভয়ে। আমার নানার অবস্থা দেখে তারা সান্ত্বনা দিয়ে বলে, আপনার কোন ভয় নেই। আমরা মুক্তিযোদ্ধা, আমাদের সবকিছু খুলে বলেন। সব কিছু খুলে বলার পরে তাকে মুক্তিযোদ্ধারা বলে, আপনার কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। আপনি আমাদের কাছে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে দেখে আমার নানার এক ভাগিনা এসেছে তার নাম খসরু। তিনিও মুক্তিযোদ্ধাদের দলে ছিলেন। সেখানে আমার নানা এবং মুক্তিযোদ্ধারা এক মাস থাকেন।

এক মাস পরে তারা সবাই দলে দুই তিন জন করে হাঁটতে হাঁটতে শ্যামনগর থানায় গিয়ে পৌঁছে। সেখান থেকে তারা আরও একদিনের পথ হেঁটে বর্ডার পার হয়ে ভারতে চলে যায়। সেখানে থেকে বুড়ির গোলনী তারা চারদিন যুদ্ধ করে। সেখান থেকে তারা সুন্দরবনের পথ হয়ে বানিয়াখালী আসে। সেখান থেকে নলিয়ান আসে। সেখানে গিয়ে তারা ধান ক্ষেতে তিন দিন না খেয়ে থাকে। সেখান থেকে মোংলাপোর্টে আসে। তারপর তারা পাক সেনাদের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ করে। মোংলাপোর্ট থেকে রামপাল আসে। তারপর রামপালের মধ্যে দিয়ে তারা খানজাহান আলী আসে। সেইখানে এসে তারা রজ্জব আলীর পার্টির সাথে দুই দিন যুদ্ধ করে। সেখান থেকে তারা দেপাড়া আসে। দেপাড়া এসে তারা বুড়ির বাড়ি ক্যাম্প করে। বৃষ্টিপুর তাদের হেড কোয়ার্টার। যাত্রাপুর পানির ঘাটে তারা যুদ্ধ করে দুইদিন। যুদ্ধ করার পরে বুড়ির বাড়ি ক্যাম্পে ফিরে যায়। তিন দিন পর কান্দাপাড়ায় তাদের সঙ্গে পাক সেনাদের সামনাসামনি যুদ্ধ হয়। তাদের কাছ থেকে আমার নানারা দুই চাকাওয়ালা হেভি মেশিনগান উদ্ধার করে। তাছাড়া আরও অস্ত্র শস্ত্র উদ্ধার করে পাক সেনাদের কাছ থেকে। তার দুই দিন পরে নাজিরপুর থানায় গজালিয়া এসে রাজাকারদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং দুই জন মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়। সেখান থেকে তারা বটিয়াঘাটা যায়। সেখানে গিয়ে আমার নানারা পাক সেনাদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করে। সেখানে দুই জন রাজাকার মারা যায়। সেখান থেকে তারা দুই দিন পরে আটগাঁও কুড়িয়ানা গ্রামে যায়। তারা সেখানে পেয়ারা বাগানে আশ্রয় নেয়। সেখানে পাক সেনাদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ হয় এবং পাক সেনাদের একজন মারা যায়। সেখান থেকে তারা কাউখালী থানা কেওইন্দা গ্রামে যায়। সেখানে তাদেরকে পাক সেনারা ঘেরাও করে। ঘেরাও করার পরে সেখানে অনেক যুদ্ধ হয় এবং অনেক পাকসেনা মারা যায়। ওখান থেকে অনেক অস্ত্র তারা উদ্ধার করে। ওই গ্রামের অনেক লোকজনও তাদের সঙ্গে ছিল। ওই গ্রামের মেয়েছেলেরা পাক সেনাদেরকে ঝাঁটা এবং লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারে। ওইখান থেকে তারা বৃষ্টিপুর ক্যাম্পে আসে। কিন্তু ক্যাম্পে আসার সময় তারা দেখে যে একটি বিরাট নদী। নদীতে অনেক নৌকা সাজিয়ে রেখেছে মুক্তিযোদ্ধাদের পার হওয়ার জন্য। কিন্তু ওই নদীতে

কারা যে ওই ভাবে নৌকা সাজিয়ে রেখেছে তার কোন লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি। বৃষ্টিপুর ক্যাম্পে আসার পর তারা রাত ১১টার পরে শুনতে পায় রেডিওতে যে, খুলনা, যশোর, বেনাপোল স্বাধীন হয়েছে। তখন তারা ওই খানে প্রায় ২৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা বাগেরহাটের দিকে যায় এবং অনেক যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধে অনেক পাকসেনা এবং রাজাকার মারা যায়। সেদিন তারা বাগেরহাট স্বাধীন করে এবং বাগেরহাট পি.সি কলেজে ক্যাম্প করে। তিন দিন পর তারা খান জাহান আলীর মাজারের কাছে যায়। কিছুক্ষণ পর মানুষের মুখে মুখে শুনতে পায় রজ্জব আলী রাজাকার সুপারী বাগানে বসে বিষ খেয়ে মারা গেছে। নানাদের দলের সবাই গিয়ে রজ্জব আলীর লাশ নিয়ে আসে বাগেরহাট সদরে। ডাকবাংলার সামনে গাছের সাথে দুই হাত পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখে। তিন দিন পর তারা লাশ নামিয়ে রাখে। রাখার পরে আস্তে আস্তে কুকুরে খেয়ে ফেলে।

তাদের উদ্দেশ্য ছিল রজ্জব আলীকে ধরার এবং কঠোর শাস্তি দেওয়ার। কেননা সে অনেক মাবোনের উপর নির্যাতন করে এবং মেরে ফেলে। আমার নানার গ্রুপলিডার ছিলেন খোকন ওরফে রফিক (বাগেরহাট)। তাদের কমান্ডার ছিল দাদা মজিদ আর্মি, রতন, আনিছ, খসরু এবং আরও অনেক লোক।

এভাবেই অনেক কষ্ট ত্যাগ স্বীকার করে স্বজন আপনজন ছেড়ে তারা অনেক দিন পরে শান্তির মুখ দেখেছে। তারা আল্লাহর রহমতে মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে পেরেছে এটাই তাদের গর্ব।

সূত্র : জ- ১০৮৭৩

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. রেজাউল করিম (রাতুল)	**মো. মিজানুর রহমান তালুকদার**
আনোয়ার হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রাম: গোলবুনিয়া, পোস্ট: রায়েন্দা
৮ম শ্রেণি, রোল: ২৩	উপজেলা: শরণখোলা, জেলা: বাগেরহাট

মেয়ে পাঁচটিকে নিয়ে চলে গেল

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে আমরা পায়ে হেঁটে ভারতের পথে রওয়ানা হয়েছি। দীর্ঘ ১২ দিন হাঁটার পর আমরা তৎকালীন বৃহত্তর যশোর বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলায় রায়গ্রাম স্কুলে গিয়ে সন্ধ্যার সময় পৌঁছালাম। লোকের সংখ্যা এত বেশি যে স্কুলে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় পাশে এক বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। তখন চরিদিকে গুলির আওয়াজ। পাশে যশোর ঝিনাইদহ রোড। রাতের অন্ধকারে পার হতে হবে, তাই পরের দিন রাত তিন টার দিকে সকলে এক সাথে রওয়ানা হলাম।

আনুমানিক লোক সংখ্যা ৫/৬ হাজার এক সাথে চলছি। দুলাল মুন্দিয়া নামক স্থান থেকে যশোর রোড পার হতে হবে। আমরা বহরের মাঝামাঝি। কিছু লোক রাস্তা পার হয়েছে, আমরা পার হব, ঠিক এমন সময় হঠাৎ একটা পাকিস্তানি সৈন্যের গাড়ি এসে রাস্তা বন্ধ করে এলোপাথাড়ি গুলি করতে লাগল। কিছু সৈন্য এসে লোক জনকে মারপিট করতে লাগল। যে যেভাবে পারে জীবন বাঁচানোর তাগিদে ছুটতে লাগলো। আমি নিরুপায় হয়ে আমার ছোট ভাই ও মাকে নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তখন দেখলাম খান সেনারা পাঁচটি মেয়ে ও ৭/৮ জন পুরুষকে ধরে নিয়ে আসলো। মেয়েগুলি কান্নাকাটি করছে। পুরুষগুলিকে টানছে ও মারছে। হঠাৎ তাদের ভেতর থেকে তিন জনের হাত থেকে তিনটি ব্যাগ টেনে নিতে চেষ্টা করল। যখন তারা ছাড়তে চাইল না তখন তাদের পেটে বেয়নেট ঢুকিয়ে দিয়ে ব্যাগ ও মেয়ে পাঁচটিকে নিয়ে চলে গেল। পরে মুক্তিসেনারা এসে লাশগুলি ঢেকে দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে ফেললো।

পরে জানতে পারলাম এর ভেতরে একই পরিবারের দুই ভাই মারা গেলো ও এক বোনকে নিয়ে গেলো। একটা হৃদয় বিদারক দৃশ্য। তার মা ও বাবার আহাজারি দেখে কেউ স্থির থাকতে পারল না।

সূত্র : জ-১১৮২০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
পুজা ঘোষাল	**নয়ন ঘোষাল**
মধুদিয়া ইচ্ছাময়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রাম: ক্ষুদ্র চাকশী, পোস্ট: রাখালগাছী
৯ম শ্রেণি, রোল: ২০	জেলা: বাগেরহাট
সদর, বাগেরহাট	বয়স: ৪৬ বছর, সম্পর্ক: পিতা

আর কাউকে যদি আশ্রয় দাও ...

একদিন আমার চাচা বাজারে যাচ্ছিলেন। সে সময় দেখলেন যে, আমাদের এলাকার এক হিন্দু চাচাকে তারা বেঁধে রেখেছে এবং অনেক হিন্দু চাচার ছেলে, বউ, মেয়ে সবাই আমাদের এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। তারা বলতে লাগলো যে, এখানে আরও হিন্দু পরিবার ছিলো তারা কোথায়? সে বললো, যে তারা সোবান খানদের বাড়ি আর কিছু লোক অন্যান্য মুসলিম পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এই বললে আমার সেই হিন্দু চাচাকে মারতে মারতে নিয়ে আসছিলো আমাদের বাড়ির দিকে। এই দেখে আমার চাচা অন্যপথ থেকে এসে আমাদের বাড়ি থেকে তাদের সবাইকে সরিয়ে দিলেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা আর তাদের পেলো না।

এরপর আমার বড় চাচা সোবান খানকে ডেকে তারা বললো যে, তোমরা কি কাউকে এখানে আশ্রয় দিয়েছ? আমার চাচা প্রাণের ভয়ে বললেন, না। সৈন্যরা আমাদের সমস্ত বাড়ি খুঁজে দেখলো, কাউকে পেলো না। আমার এক হিন্দু কাকিমার সিঁদুরের কৌটা তারা পেলো। তারা আমার চাচাকে ধরে বাঁধলেন এবং তাকে অনেক মারতে লাগলো। মারের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি বললেন, আমাকে গুলি করে মেরে ফেল। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এই শুনে তারা তাকে গুলি করার জন্য তৈরি হলো। এই দেখে আমার দাদিমা তাদের পা ধরে অনেক কাঁদতে লাগলেন। তারা তাকে এই সময়ে না মেরে নিয়ে গেলো তাদের ঘাঁটিতে। সেখানে তাদের কমান্ডারকে সব বললো। তখন কমান্ডার পা ভেঙে দিলো এবং বললো, আর কাউকে যদি আশ্রয় দাও তাহলে তোমাকে মেরে ফেলবো। এই বলে তারা তাকে ছেড়ে দিলো। কিন্তু তারা তার চোখের সামনে দড়ি দিয়ে বেঁধে হত্যা করলো আমাদের এলাকার অনেক যুবককে।

সূত্র : জ-১১৮২৬

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মোহাম্মদ আলী খান	**এসকেন্দার আলী খান**
মধুদিয়া ইচ্ছাময়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রাম: ক্ষুদ্র চাকশী
৮ম শ্রেণি, রোল: ১০	পোস্ট: রাখালগাছী, জেলা: বাগেরহাট
	বয়স: ৫৫ বছর

দেশে তাড়াতাড়ি ফিরিস

আমার বাবার বয়স তখন ১৩ থেকে ১৪ বছর। যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন সবাই এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে। একদিন রাজাকাররা এসে আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। আমার বাবা, ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা, পিসিমা, আমার জেঠুমনি সবাই এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগলেন। আমার বাবা দেখলেন রাজাকাররা সব মালামাল নিয়ে যাচ্ছে। বাবা বললেন, ভাই ওই থলেটা আমাকে দিন। রাজাকাররা বললো, এই ছেলে তুই এখান থেকে চলে যা। না হলে তোকে মেরে ফেলব। বাবা তখন ঠাকুরদাদা এবং অন্যান্য সবার কাছে গেলেন। কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে বললেন, বাবা, আমাদের সব কিছু নিয়ে যাচ্ছে ওরা। তখন ঠাকুরদাদা বললেন, বাবা তুই ওখানে আর যাসনে। কিন্তু বাবা তা শোনেনি। কাঁদতে কাঁদতে আবার দৌড় দিতে গেলেন। তখন একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেলেন। একটু এগিয়ে দেখেন আমাদের বাড়ির এক কাকাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। ওমনি বাবা এক পা দুপা ফেলে আতঙ্কিত হয়ে ফিরে গেলেন সবার কাছে। একটা আম বাগানে সবাই ছিলেন। সেখানে একটা বড় সেগুন গাছ ছিল। সেই গাছের উপর সবাই চড়ে বসলেন। উঠে দেখলেন আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। বাবা, জ্যাঠামনি, সবাই দেখলেন মাত্র একটা ঘর বাকি আছে পুড়তে। তখন সেই ঘরে সবাই ঢুকলেন। ঢুকে দেখলেন অনেকগুলো লাশ পড়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে একজনের মাথা আলাদা। তখন সবাই হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন।

একটু পরে রাজকাররা আবার এলো। তখন সবাই এদিক ওদিক পালাতে লাগলেন। দুইজন লোক আর পালাতে পারেননি। তারা একই সঙ্গে দৌড়াতে গিয়ে একটি গর্তের ভিতর পড়ে গেলেন। তখনি তাদের ধরে বসলো। বাবা একটু হলেই ধরা পড়তেন। বাবা একটু দূরে বসে দেখছিলেন ওদেরকে ধরেছে। পাশেই একটা নদী। নদীর পাড়ে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেললো। বাবা দেখেও তাদের বাঁচাতে পারলেন না।

আর একদিন বাবা, ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদা, সবাই এক জায়গা বসে খাচ্ছিলেন। অমনি কয়েকটা বোমের আওয়াজ শোনা গেল। মনে হলো যেন কাছাকাছি। ঐ শব্দটা শুনে না খেয়েই পালালেন। বাবার দুঃসম্পর্কের ভাই ধরা পড়েছেন রাজাকারদের হাতে। তখন বাবা চিনতে পারলেন তিনি গলা ফাটিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বাবার সামনেই তাকে ধরে রেখেছে। বাবা একটা গাছের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই গাছের গোড়াতেই তাকে এক কোপ দিয়ে মেরে ফেললেন। বাবা মুখে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাবা গাছের উপর ভালো করে দাঁড়াতে পারছিলেন না। হাত,পা সারা শরীর কাঁপতে লাগলো। তারপর রাজাকাররা লাশটাকে ফেলে চলে গেলো। একটু পরে গাছ থেকে নেমে কাকাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলেন।

আর একটি সত্যি ঘটনা। একদিন আমার দাদু, দিদা, মামা পালাচ্ছিলেন। তখন আমার মা ছোট। দিদা মাকে কোলে করে হাঁটতেন। তখন আবার আমার দাদু প্যারালাইসড। দাদু এক পাও হাঁটতে পারেন না। মা এবং দিদা দুজনে দুই হাত ধরে একটু আগাচ্ছিলেন। এমন করে দুই তিন দিন কেটে গেলো। তখন দেখলেন যে এ দেশে থাকলে আমরা বাঁচতে পারব না। তখন দাদুকে ফেলে রেখে মামা, দিদা, সবাই চলে গেলেন। দিদা যেতে চাইছিলেন না। দিদা বলেছিলেন, আমি তোর বাবার সঙ্গে থাকি। মামা বললেন, না মা, এখানে থাকলে আমরা সবাই একই সঙ্গে মারা যাবো। তার চেয়ে বাবাকে এই বাড়িটায় রেখে আমরা ভারতে চলে যাই। দিদা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন। দাদু কাঁদতে কাঁদতে বললেন তোরা যা, আমি এখানেই থাকব। ওই দেশ থেকে ফিরে এসে আবার আমার কাছে আসবি। দিদা যেতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই। যেতেই হবে। দাদু বললেন, তোরা সাবধানে চলাফেরা করিস। আর দেশে তাড়াতাড়ি ফিরিস। যাতে আমি আমার দেহত্যাগ করার আগে তোদের একবার দেখতে পাই। আমার দাদুকে ফেলে রেখে যেতে বাধ্য হলেন। পরে দীর্ঘ নয় মাস পরে দেশ স্বাধীন হলো।

সূত্র : জ-১১১৮৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
দীপা	**দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল**
শহীদ হেমায়েত উদ্দিন বালিকা বিদ্যালয়	গ্রাম: আটগুড়ি, থানা: মোল্লারহাট
৯ম শ্রেণি, রোল: ২৭	জেলা: বাগেরহাট
	বয়স: ৫৩ বছর, সম্পর্ক: বাবা

নাম হয় পারভীন ফারুকী

বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট থানাও পাকিস্তানিদের হাতের নাগালে। এমনি সময় মোল্লাহাট থানার পাশ দিয়ে বহমান মধুমতী নদীতে পিরোজপুর জেলার এক স্বর্ণকার পরিবার প্রাণ ও ধন রক্ষার্থে নৌকাযোগে পালাচ্ছিলো। পরিবারের ৮ জন পুরুষ, ৩/৪ জন মহিলা, তাদের অন্ধ পিতামাতা এবং এক অপূর্ব রূপসী যুবতী অনুভা। মোল্লাহাটবাসী আগে থেকেই পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের জ্যাকোবাবাদ জেলার পাঞ্জাবি পুলিশ বাহিনীর কাছে জিম্মি। হঠাৎ তৎকালীন ওসি, দারোগা জাফর আহমেদ ফারুকীর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে উক্ত নৌকার যাত্রীদের উপর। পাড়ে নৌকা ভিড়িয়ে আট জন পুরুষকে তারা এক লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে। এ সময় একজন সুকৌশলে পানিতে ঝাঁপ দেয় যাকে হানাদারেরা অনেক গুলি করেও মারতে পারেনি। অপরদিকে অন্ধ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে তারা চিড়া-গুড়সহ কলার ভেলায় ভাসিয়ে দেয়। মহিলাদের রাজাকারদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। পরে অবশ্য রাতের অন্ধকারে মুক্তিবাহিনী তাদের উদ্ধার করে। রয়ে যায় অভাগিনী অনুভা। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে জাফর আহমেদ তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। কিন্তু নৌকাটি কি এক ঐশ্বরিক ক্ষমতায় নাকি বিধাতার লেখায় নদীতে ডুবে যায়।

অনুভাকে সঙ্গে করে এনে তাকে মুসলমান বানানো হয় এবং জাফর আহমেদ তাকে বিয়ে করে। তার মুসলমান নাম হয় পারভীন ফারুকী। অনুভার কাছ থেকে সব শুনে পাঞ্জাবি বাহিনী উক্ত নৌকা উদ্ধারের চেষ্টা চালায়। কিন্তু ব্যর্থ হয়। মোল্লাহাট থানায় যুদ্ধের পর ''সেভেন মার্ডার' নামে একটি কেস হয়। কিন্তু কালক্রমে কিভাবে এর নিষ্পত্তি হয় তা জানা যায়নি। কেন এই বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, কেনই বা স্বজন হারাবার বেদনা আর এক বুক জ্বালা নিয়ে অনুভাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছিল! তা আমি জানি না। জানি লাল সবুজ পতাকা রক্তাক্ত ইতিহাস ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে মহা গৌরবে।

সূত্র : জ-১১২০৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
ফারহানা হক মুন্নী	**মিরাজুল ইসলাম**
শহীদ হেমায়েত উদ্দিন বালিকা বিদ্যালয়	গ্রাম: গাড়ফা, থানা: মোল্লাহাট, জেলা: বাগেরহাট
৭ম শ্রেণি, রোল: ০১	বয়স: ৫৫ বছর, সম্পর্ক: মামা

না, আপনারা থাকেন

প্রথম দিনে ঝালকাঠিতে আগুন দিয়েছিলো। গানবোট নদী দিয়ে চলাফেরা করত। যাকে সামনে পেত তাকেই গুলি করত। এইভাবে চলতে থাকল। তারপরই গ্রামে নামল। গ্রামে নামার পর সবাই বন-জঙ্গলে পালাত। সন্ধ্যার দিকে এসে ভাত রান্না করত। রাতে ডাকাত আসত। রাতে আবার পালাতে হত। রাতের শেষে আবার বাড়ি

আসত। খাওয়া দাওয়া সেরে আবার পালাত। এক গ্রাম হতে আর এক গ্রামে পালাতে যেত। সারাদিন না খেয়ে থাকতে হত। সন্ধ্যায় বাড়ি আসত।

প্রতিদিন মানুষের ঘরে ঘরে আগুন দিত। একদিন সকালে ভাত রান্না করেছে, কিন্তু আর খাওয়া হয়নি। সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল যে পাকিস্তানিরা আসছে। সবাই প্রাণের ভয়ে পালাতে লাগল। আমার দাদাভাই বাড়ি থেকে যেতে চাইল না। ঠাকুরমা বলল, আপনিও আমাদের সাথে চলেন। একথা বলাতে দাদুভাই একটা বাঁশ এনে ঠাকুমাকে পিটাতে চাইল। বললো, তোমরা বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাও। আমি তো পুরুষ মানুষ, এক দিকে দৌড় দিতে পারব। ঠাকুমা কান্না করতে করতে দৌড়াতে লাগল। যাওয়ার পর এক পুকুর পাড়ের জঙ্গলের ভিতর গিয়ে বসলেন। পাকিস্তানিরা এসে বাড়ি-ঘর সব কিছু ঘিরে ফেলল। দাদু ভাই যে কোন দিকে গেল তা আর কেউ জানল না। ঠাকুমাদের ঘরে আগুন দিল। যখন দাদু ভাই পালানোর জন্য দৌড়াতে গেল, তখন পাকিস্তানিরা দেখে ফেলে। একটা পুকুরের পাশে আম গাছের ধারে আমার দাদুভাইকে গুলি করে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানিরা চলে যাবার পর, সবাই যখন বাড়ি আসল, বাড়িতে তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল। সবাই বাড়িতে আসলেও দাদুভাই বাড়িতে আর ফিরে আসেনি। তারপর ঠাকুমা আর বাবা দাদুর খোঁজে বের হয়। ঘুরতে ঘুরতে দাদুকে এক সময় পুকুর পাড়ে পড়ে থাকতে দেখতে পায়। ঠাকুমা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তারপর ঠাকুমার আর মনে নেই। জ্ঞান হবার কিছুক্ষণ পর শুনতে পেলেন যে, তাদের গ্রামে পশু-পাখি পর্যন্ত থাকবে না। তার পরপরই ঠাকুমাদের স্কুলের সামনে মেশিনগান ছাড়লো। ভয়ে তারা এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে গিয়ে এক কলাবাগানে লুকালো। পাকিস্তানিরা যখন চলে গেল, তখন সবাই বাড়ি গেল।

এর মধ্যে একদিন আবার শোনা গেল গোলাগুলির শব্দ। একটি স্কুলের মধ্যে পাকিস্তানিরা ঢুকে গেল। আর রাস্তার ওপারে মুক্তিবাহিনী। দুদিক দিয়ে গুলি বিনিময় হয়। পাকিস্তানিরা ভয়ে স্কুলের জানালা ভেঙ্গে পালালো।

রাতে নৌকায় করে শিরযুগ গেলেন। সেখানে এক রাত থাকলেন। তারপর ডুমুরিয়ায় এক বাড়ি এসে উঠলেন। বাড়িতে কোন লোকজন ছিল না। শুধুমাত্র দুইজন বৃদ্ধ লোক ছিল। সেখানে কিছুদিন থাকার পর এক মুসলমান লোক এসে বললেন, আপনারা বাড়ি চলুন, এখন আর ভয় নেই। সবাই সেখান থেকে বাড়ি আসলেন। কিছুদিন ভালভাবে কাটাবার পর আবার শুনতে পেলেন যে, পাকিস্তানিরা আসছে। সবাই পালাল।

তারপর সবাই ঠিক করল ভারত যাবে। কিন্তু আর যাওয়া হল না। মুক্তিবাহিনীর লোক এসে বলল, যারা ভারতে যাননি তারা আর যাবেন না। আমরা আপনাদের রক্ষা করবো। তারপর ঠাকুমা বললেন, আমরা আমাদের বাড়ি যাবো। নৌকায় করে আমাদের বাড়ি গেলেন। তখন সব জায়গায় পানি আর পানি। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে শুনতে পেলেন বাড়ির ভিতরে গান বাজনা, বই পড়া হচ্ছে। ঠাকুমা আমার ফুফা/ পিসেমশাইকে বললেন, তুমি একটু জঙ্গলের ভিতর যাও। ঠাকুমা আর দিদি এই কথা বলে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেলেন। বাড়ির ভিতরে দেখলো যে প্রায় একশ বা দুইশ মুক্তিযোদ্ধা। ঠাকুমাকে দেখে মুক্তিবাহিনী বললে, এটা কি আপনার বাড়ি? ঠাকুমা বললেন, হ্যাঁ। মুক্তিবাহিনী বললেন, তাহলে আপনাদের বাড়িতে আপনারা থাকেন। ঠাকুমা বললেন, না, আপনারা থাকেন, আমরা চলে যাচ্ছি। মুক্তিবাহিনীর একজন ১০ টাকা আমার দিদির হাতে দিলেন। তারপর নৌকায় করে ফিরে এলেন শিরযুগ। কিছুদিন সেখানে থাকলেন। তারপর আবার পাকিস্তানিরা আসল। এর মধ্যে সবাই পালাতে গেল। আমার ঠাকুমা ও আর একজন মহিলা বাড়িতে থাকলেন। পাকিস্তানিরা এসে বাড়ির সব কিছু নিয়ে গেল। আর একজন মহিলা যিনি ছিলেন তিনি বললেন, ও বাবারা, আমার ছেলে গেছে পালাইতে একখানা গামছা পরে, এসে পরবে। তাই ওর এই ধুতিটা রেখে যাও। পাকিস্তানিদের একজন তার মাথা থেকে ধুতিটা খুলে ফেলে দিল। আর বলল, এই নে তোর ছেলের ধুতি, যদি তাকে পেতাম তাহলে গুলি করে মারতাম।

সন্ধ্যায় সবাই বাড়ি আসল। কিন্তু তিনটা লোক আসে নাই। কিছুক্ষণ পর আমার পিসিমনি আসলেন। আর দুইজন আসে নাই। তারপর শুরু হলো কান্না। সবাই ভাবল তারা বুঝি মারা গেছে। তখন যে যার প্রাণ নিয়ে পালাত। কেউ জানত না কে কোথায় গেছে। তারপর আমার বাবাকে নিয়ে একটা মুসলমান লোক ঐ রাতে আমাদের বাড়িতে আসলেন। বাবাকে তিনি তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন, আর একটা লোক আসে

নেই। তারা আবার কান্না শুরু করল। কিন্তু তখনই আমার ফুফাকে/ পিসেমশাইকে নিয়ে তার মুসলমান বন্ধু এলেন। তিনি তার বন্ধুর কাছে ছিলেন। তার মুসলমান বন্ধু ৫ কেজি চাল ও কিছু টাকা দিয়ে চলে গেলেন। এভাবে ৫/৬ দিন থাকলেন। তারপর আর এক গ্রামে চলে গেলেন।

সেখানে শত শত মুক্তিযোদ্ধা এসে বললেন, আর কোন যুদ্ধ হবে না। আমরা সে রকমই প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। তার পরপরই ভারত সরকার সৈন্য পাঠালো। এরপর আরও বড় রকমের যুদ্ধ হলো। যুদ্ধ করতে করতে আমাদের সেই সময় এসে গেল- যখন আমাদের দুঃখের অবসান ঘটিয়ে আমাদের দেশ স্বাধীন হলো।

সূত্র : জ-১১২২২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
নিপুনিকা মজুমদার	**যশোদা মজুমদার**
শহীদ হেমায়েত উদ্দিন বালিকা বিদ্যালয়	গ্রাম: মোল্লাহাট, পোস্ট: মোল্লাহাট,
৭ম শ্রেণি, রোল: ২৫	জেলা: বাগেরহাট, সম্পর্ক: ঠাকুরমা

মায়ের আঁচলের মধ্যে লুকায়

আমি আমার পাশের বাড়ির একজন লোকের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনেছি। তিনি সম্পর্কে আমার ফুফা হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বয়স ১৪-১৫ বছর। তখন তিনি অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তার নাম মো. আ. মজিদ গাজী। তিনিও বলতে গেলে তখনকার মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি যেহেতু ছোট ছিলেন তাই তিনি দেশের জন্য বেশি কিছু করতে না পারলেও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে থেকে তাদের অনেক কাজে সহযোগিতা করেন। তাদের কাছে অস্ত্র অর্থাৎ বাঙালিদের যা কিছু ছিল তাই আনা নেওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। নিম্নে তার দেখা এবং আমার শোনা কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপন করা হলো–

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সারা দেশজুড়ে ছিল অরাজকতা। এই মুক্তিযুদ্ধের সময় চৌদ্দ/পনের বছরের বালক মো. আ. মজিদ গাজী নারকেল বিক্রয়ের জন্য গোয়ালমাঠ বাজারে আসেন। তখন দেখতে পান রাজাকার ছেকেন সরদার, সুলতান ডাকুয়া, লতিফ তালুকদার, ফজর কাজী ও মোতালেব সরদার। এমন সময় সুলতান ডাকুয়ার বোন ইব্রাহিম খাঁ-এর স্ত্রী ওখানে উপস্থিত হয় এবং রাজাকারদের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। ঠিক এমন সময় (বেলা ৪:৩০) নরেন্দ্রপুর থেকে বৃদ্ধ আকুব আলী শেখ নারকেল বিক্রি করতে গোয়ালমাঠ বাজারে আসেন। এই আসাই তার শেষ আসা। এখান থেকে সে আর বাড়ি ফিরে যায়নি। নিষ্ঠুর রাজাকারদের মধ্য হতে ছেকেন সরদার ও ফজর কাজী আকুব আলী শেখকে বেঁধে দোবাড়ীয়া মাদ্রাসার সামনের পোলের উপর নিয়ে যায়। সেখানে উপস্থিত হয় অনেক মানুষ। কিন্তু এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস কোনো ব্যক্তির হয়নি। তখন ছিল আছরের নামাজের ওয়াক্ত। আকুব আলী তখন নামাজ পড়ার অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়। সে তাইমুম করে ঐ পোলের উপর নামাজ পড়ে। আকুব আলী শেখকে রাইফেল দ্বারা গুলি করে ছোট খালের ভেতর ফেলে দেয় এবং সেখানেই তার জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

ওই দিন এক ঘণ্টার ব্যবধানে কাকারবিল নিবাসী আশরাফ মৃধার পিতা শফিক মৃধা এবং ভাই মো. সাহা মৃধাকে রাজাকাররা গোয়ালমাঠ বাজার হতে রশি দ্বারা বেঁধে রিক্সায় করে ফতেপুর বাজারে নিয়ে যায়। অনেক কাকুতি মিনতি এবং কান্নাকাটির পরেও রাজাকাররা ঐ পিতা-পুত্রকে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দেয় নি। সন্ধ্যার আগখানে পিতা ও পুত্রকে এক সঙ্গে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ দৃশ্য দেখে কেউ চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না। আশরাফ মৃধা তার পিতার ও ভাইয়ের লাশের পাশে বসে কাঁদতে থাকে এবং পরে খালের ভিতর দিয়ে লাশ টেনে বাড়ি এনে দাফন-এর ব্যবস্থা করেন।

লিবারেশন পিরিয়ডে একদিন সকালে (৭-৮টা) প্রতিদিনের মত ফজরের নামাজ শেষে মো. আবুল মজিদ গাজী ও আতিয়ার মোল্লা পানি আনার জন্য রাড়ীপাড়ার মধ্যে একটা পুকুরে পানি আনতে যায়। তখন তারা দেখে পুকুর

পাড়ের হিন্দুপাড়ার মধ্যে হইহুল্লোড়। তারা সে দিকে ফলো করে দেখে তারাপদ ঘোষ, শিবনারায়ণ বসু ও দুলাল চন্দ্র ঘোষদের বাড়ি লুটপাট হচ্ছে। তারা জানতে পারে মনছুর ডাকুয়া লুটকারীর সর্দার, তার দলবল নিয়ে এই বাড়ি লুট করে। সবশেষে লুটকারীর সরদার তারাপদ ঘোষের ১৬-১৭ বছরের মেয়ে পাখি রানীকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। পরে শোনা যায় পাখি রানী ৭-৮ দিন পর রাজাকার মনছুর ডাকুয়ার হাত থেকে মুক্তি পায়। তারা যখন পুকুর পাড় দিয়ে যাচ্ছিল তখন তারা আ. মজিদ ও আতিয়ার মোল্লাকে দেখতে পেয়ে এদের কলসী ভেঙে ফেলে এবং বলে, তোরা আমাদের সাথে আয়। তারা কাঁদো কাঁদো নয়নে বাড়ি ফিরে যায়।

এই মুনসুর ডাকুয়ার ওই পিরিয়ডে পার্শ্ববর্তী গ্রামের আমীর আলী শেখের সুন্দরী মেয়ের উপর চোখ পড়ে। সে আপত্তি করাতে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তার মেয়ে রাহিলা খানমকে তুলে নিয়ে এসে বিয়ে করে। যুদ্ধের সময় মো. আ. মজিদ গাজী তার ফুফু বাড়ি বারইখালি গ্রামে বেড়াতে যান। রাতে যখন তারা খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমাতে যান তখন সে বাড়ি রাজাকাররা আটক করে। মজিদ গাজী তখন মশারি পেঁচিয়ে খাটের নিচে ঢুকে পড়ে থাকে। তার ফুপাত ভাই, নাম নুরা দর্জি, সেও তার খালার বাড়ি বেড়াতে যায়। একই সাথে তাকে রাজাকাররা বড় রামদা দিয়ে আঘাত করে এবং বেদম পিটুনি দেয়। ঐ বাড়ির ফুফু বকুল বেগমের গায় কেরোসিন ঢেলে দেয় এবং আগুন ধরিয়ে দিতে যায়। তখন বকুল ফুফু তার সব স্বর্ণ অলংকার রাজাকারদের দিয়ে দেয় এবং সে প্রাণে বেঁচে যায়। ইতোমধ্যে তার স্বামী ছিদ্দিক খাঁ খড়ি দুয়োর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। বকুল বেগমের ঘরে ১৫-১৬ বছরের এক মেয়ে ছিল। সে তার মায়ের আঁচলের মধ্যে লুকায়। কিন্তু সে শয়তানদের চোখ ফাঁকি দিতে পারে নি। একজন তার হাত ধরে মাটিতে ফেলে দেয়। তার মা মেয়ের গায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে মেয়েকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু তিনি পারেন নি তার মেয়েকে ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করতে। তার চোখের সামনে তার মেয়ে হয়েছে ধর্ষিতা। এমন সময় বকুল ফুফুর স্বামী অর্থাৎ মামাই লোকজন ডেকে এনে বড় করে হাঁকডাক দিলে রাজাকারা চলে যাওয়ার সময় তাদের পাশের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যায়।

সূত্র : জ-১০৯৬২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
লাখি আক্তার	**মো. আব্দুল মজিদ গাজী**
গোয়ালমাঠ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	গ্রাম: শ্রীরামপুর, থানা: কচুয়া, জেলা: বাগেরহাট
১০ম শ্রেণি	বয়স: ৫২ বছর

সানন্দা বৈরাগী বেঁচে আছেন

১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের পর দেশের বিভিন্ন জায়গায় রাজাকার বাহিনী ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এরই ধারাবাহিকতায় বাগেরহাট জেলার রজ্জব আলি হাওলাদার তার বিরাট রাজাকার বাহিনী নিয়ে বাগেরহাট রামপালে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সংখ্যালঘুদের ঘর, বাড়ি ধন সম্পদ লুটপাট করে ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে এবং হাজার হাজার নিরীহ নরনারী নির্মমভাবে হত্যা করে। এমনকি ছোট শিশুরাও তার হাত থেকে রেহাই পায় না এবং নারীদের চরমভাবে নির্যাতন করে। এমনি এক সময়ে মোংলা বন্দরে অবস্থানকারী পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু বিহারি নজির খান-এর নেতৃত্বে মোংলার আশেপাশের গ্রামগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে। শেলাবুনিয়া এবং কানাইগর গ্রামে তিন/চারটি পরিবারের ৮/৯ জন লোককে নির্মমভাবে হত্যা করে।

এর ভেতর একদিন সকাল বেলায় নজির খানের নেতৃত্বে ৬/৭ জন বিহারি মাদকাসক্ত হয়ে কানাইনগরে প্রবেশ করে। তাদের কাছে কিছু ধারালো অস্ত্র ছিল। এতে গ্রামের লোকজন ভীত হয়ে বাড়ি ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় পালায়। এরই এক পর্যায়ে উক্ত বাহিনী কানাইনগর গ্রামের দ্বিজবর বৈরাগীর বাড়িতে প্রবেশ করে। এর আগেই ঐ বাড়ির মহিলাসহ ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। শুধু দ্বিজবর বাবুর স্ত্রী সানন্দা বৈরাগী এবং বাড়ির ৪/৫

জন পুরুষ থাকে। নজির খানের সাথে দ্বিজবর বাবুর এবং অন্যান্যদের পরিচয় ছিল। নজির খান বাহিনী দ্বিজবর বাবুর কাছে টাকা দাবি করলে তার কাছে টাকা না থাকায় বাড়িতে ধান ও চাল নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। এর মধ্যেই হঠাৎ করে তারা ধারালো ছোরা নিয়ে বাড়ির লোকজনদের আক্রমণ করে। আক্রমণ করলে দ্বিজবর বাবু তার হাতের লাঠি দ্বারা নজির খানকে বাড়ি মেরে দৌড়ে পালায়। সাথে অন্যরাও পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের মধ্যে পরিমল বৈরাগী (পিতা বিনোদ বিহারি বৈরাগী) তাদের হাতে ছুরিকাহত হয়ে মারা যায় এবং দ্বিজবর বাবুর ছোট ভাই ধীরেন্দ্রনাথ বৈরাগী তাদের হাতে ধরা পড়লে তাকেও তারা জবাই করে হত্যা করে। এই ঘটনার মধ্যে দ্বিজবর বাবুর স্ত্রী সানন্দা বৈরাগী বাড়ির মধ্যে কুটার পালার পাশে লুকিয়ে পড়েন। এই হত্যাকাণ্ডের পর উক্ত বাহিনী অন্য লোকদের খোঁজাখুঁজি করতে থাকে এবং দ্বিজবর বাবুর স্ত্রীকে কুটার পালার পাশে দেখতে পায়। নজির বাহিনীর লোক তাকে ছুরি দ্বারা শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ৮টি কোপ দেয় ও লোহার রডদ্বারা মাথায় বাড়ি দেয়। এমত অবস্থায় তিনি জ্ঞানহারা হয়ে মাটতে লুটিয়ে পড়েন। দেড় দুই ঘণ্টা পর দ্বিজবর বাবু ও অন্যান্য লোকজন চিলা গ্রামে গিয়ে তার পরিবারের বাকি লোকদের সাথে মিলিত হয় এবং উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলে সবাই কান্নাকাটি করে। এর দুই তিন ঘন্টা পর দুপুরের দিকে লোকমারফত সংবাদ পাওয়া যায় যে, দ্বিজবর বাবুর স্ত্রী সানন্দা বৈরাগী বেঁচে আছেন এবং বাড়িতে ঘোরাফেরা করছেন। তখন তার ভাইপো মুকুন্দ বিহারী বৈরাগী কয়েকজন লোকসহ বাড়িতে আসে এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তার জেঠিমা সানন্দা বৈরাগীকে নিয়ে চিলা গ্রামে রমেশ ডাক্তারের বাড়িতে নিয়ে যায় এবং সেখানে তিন চারদিন চিকিৎসা করার পর নৌকাযোগে সপরিবারে বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে রিক্ত হস্তে সবাই ভারতে চলে যায়।

মোংলা বন্দরে বিশিষ্ট এলএমএফ ডাক্তার শেখ মহম্মদ অলিউল্লার কম্পাউন্ডারের মুখে শোনা যায় যে, শোলাবুনিয়া নিবাসী মান্দার পোদ্দার তার পূর্বের পাওনা টাকা আনার জন্য ডাক্তার অলিউল্লার চেম্বারে গেলে তিনি তাকে লাথি মেরে গলাধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেন এবং কয়েকজন রাজাকারকে ডেকে বলে, তোরা একে ধরে নিয়ে যা। তার নির্দেশে রাজাকাররা মান্দার পোদ্দারকে ধরে নদীর তীরে জেটিতে নিয়ে হত্যা করে। পরে উক্ত পোদ্দার বাড়ির আরও চার-পাঁচজনকে রাজাকাররা নির্মমভাবে হত্যা করে। এছাড়াও ঘর জ্বালানো পোড়ানো, অর্থ সম্পদ লুটপাট করে রাজাকাররা এলাকার সংখ্যালঘুদের বাড়িছাড়া করেছে এবং অনেক মা বোনদের ইজ্জতহানি করে তাদের নির্মম অত্যাচার করেছে।

সূত্র : জ-১১৫৮২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
দীপ্ত বৈরাগী	**মুকুন্দ বিহারী বৈরাগী**
সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স: ৬৩ বছর
৮ম শ্রেণি, শাখা: হলুদ রোল: ৮৩৪৫	
মোংলা, বাগেরহাট	

টুপির ভিতর পাকিস্তানি গ্রেনেড

আমার এক প্রতিবেশী কাকার নাম কমলেশ মণ্ডল, পিতা মৃত জ্যোতিশ মণ্ডল, বাগেরহাট। ১৯৭১ সালে পাকহানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচারে এদেশের ৩০ লক্ষ লোক জীবন দেয়। অসংখ্য নারীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে হানাদাররা। তখন আমার কাকার বয়স মাত্র ১৯ বছর। হানাদার বাহিনীর এই পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় কাকার সুপ্ত হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে। দেশের আত্মীয়-স্বজন সব ফেলে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে পালিয়ে চলে যান ভারতে। সেখানে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাদুড়িয়া ক্যাম্পে থাকাকালীন জানতে পারলেন মুক্তিবাহিনীতে লোক নেবে। কাকার বিদ্রোহী মন তখন দেশমাতৃকার টানে উত্তাল হয়ে উঠল। যে করেই হোক তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবেন। লিস্টে নাম লেখালেন। কিন্তু বাধা হলো শিক্ষাগত যোগ্যতা। এইচএসসি পাশ ছাড়া কোন লোক নেবে না। কিন্তু তার হৃদয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন, তাকে আর আটকায়

কে। তার নিজস্ব ৫/৬ জন বন্ধুসহ কলকাতার অফিসে ঢুকে নাম লেখালেন। শুরু হলো ট্রেনিং এর পালা। কলকাতা থেকে ট্রেনযোগে বিহার। সেখান থেকে সেনাবাহিনীর ট্রাকে করে গিয়ে নামলেন রামপুরহাট। যেদিকে তাকান ধু-ধু মাঠ। জনমানবশূন্য মাঠের মধ্যে চোখে পড়ে দু-একটা বাওড়। কাকার ব্যাচের ওস্তাদ ছিলেন ভগীরথ সিং। প্রত্যেক গ্রুপে ছেলে ছিল ৫০ জন করে। ২ মাস ১০ দিন কঠোর পরিশ্রম হলেও মনের উদ্যমে ট্রেনিং শেষ করেন। উল্লেখ থাকে যে, যারা ওই সময়ে কাকার সহযোদ্ধা ছিলেন তারা কাকার যোগ্যতা ও সাহসিকতার প্রতিমূর্তি হিসাবে তাকে 'ভগীরথ' বলে ডাকতেন। রামপুরা থেকে আসলেন বশিরহাট। এখানে আসলে কাকার হাতে অস্ত্র তুলে দিলেন আ. জলিল গাজী ও নারায়ণ চন্দ্র ঢালী। বশিরহাট থেকে নদী পার হয়ে দেবহাটায় কামরুজ্জামান টুকু-এর নেতৃত্বে ৫০ সদস্য-বিশিষ্ট দলে যোগ দেন। রাত সাড়ে আটটার দিকে যখন তারা ডাল-ভাত খেতে বসেছেন তখনই এলাকার রাজাকার আলবদররা গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পাকবাহিনী নিয়ে তাদের উপর হামলা করে। সঙ্গে সঙ্গেই তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হানাদার বাহিনীর উপর গুলিবর্ষণ করে। এক পর্যায়ে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। হানাদার বাহিনী যেখানে পজিশন নিয়েছিল সেখানে রক্ত দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু কোন মৃতদেহের সন্ধান পান নাই।

কাল বিলম্ব না করে জায়গা পরিবর্তনের জন্য দেবহাটা থেকে ৬৫ মাইল পথ পায়ে হেঁটে ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে কাঁচা লাউ, মুলা, কাঁচা কলা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে চুকনগরে সুভাক্ষ নন্দীর বাড়ি সন্ধ্যার সময় পৌঁছে। সেখানে পৌঁছামাত্র হিন্দু ধর্মীয় বারের পুজোর দুধ তাদের খেতে দেন। সেখান থেকে একটা পরিত্যক্ত স্কুলে তারা আশ্রয় নেন। গোপন সূত্রে খবর পায় চুকনগরে খালের ওপারে রাজাকার ও পাকবাহিনী বাংকার করে পজিশন নিয়ে আছে। রাত আনুমানিক আট-টার সময় কাকার বাহিনী হানাদার বাহিনীকে হামলা করে। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা গোলাগুলির পর তারা তাদের স্কুলে ফিরে আসেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গোলাগুলিতে একজন মুক্তিযোদ্ধা পীযূষ প্রাণ হারায়।

পরদিন বেলা আনুমানিক ১১টা। অধিকাংশ সহযোদ্ধারা খাওয়ার জন্য ব্যস্ত। ঐ সময়ে প্রহরার দায়িত্বে ছিলেন কাকা, সুবাস এবং নিরঞ্জন। এমন সময় দেখা গেল পাগল বেশে একটি লোক স্কুলের সামনের বিল পাড়ি দিয়ে স্কুলের দিকে এগিয়ে আসছে। যখন সে পানি থেকে উপরে উঠল কাকা তাকে হাত তোলার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু সে কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে পাগলের অভিনয় করে স্কুলের গেটের দিকে এগুতে থাকে। বার বার তাকে হুঁশিয়ার করার পরেও যখন শুনল না কাকা তাকে একটি মাত্র গুলিতে ভূপাতিত করলেন। গুলির শব্দ শুনে দলের অন্যান্যরা যখন ছুটে এলো পাগল তখন মৃত। কমান্ডার কামরুজ্জামান টুকু এসে কাকাকে তিরস্কারের পর কোমরস্থিত রিভলবার দিয়ে গুলি করতে উদ্যত হলো। কিন্তু কিছু লোক কমান্ডারকে সান্ত্বনা দিয়ে যখন পাগলটাকে তল্লাশি চালালো তখন দেখতে পেলো তার মাথার টুপির ভিতর একটি পাকিস্তানি গ্রেনেড। মূলত ঐ পাগলটা ছিল একজন আত্মঘাতী রাজাকার। এই ঘটনার পর কমান্ডার কাকাকে ঘিরে নিয়ে কি আনন্দ! আর বলতে লাগলেন আজ ভগীরথের জন্য আমরা সবাই বেঁচে গেলাম।

চুকনগর থেকে তারা খুবই সতর্কতার সাথে খুলনা এসে পৌঁছেন। খুলনা থাকাকালীন তারা লবণচরা, বটিয়াঘাটা, গল্লামারী অপারেশন চালানোর পর হাচান সাহেবের লঞ্চ যোগে সুগ্রাম বিলা এসে পৌঁছান। সেখানে তেজিনখালী ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে আশ্রয় নেন। ঐ স্থানে যারা রাজাকার আলবদর ছিল তারা মুক্তিবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।

সপ্তাহ খানেক থাকার পর কাকা জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। ঐ সময় তার অস্ত্রশস্ত্র গ্রুপ কমান্ডার নারায়ণ চন্দ্র ঢালীর কাছে জমা দিয়ে সুজনহারা অবস্থায় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী গান্ধী হালদার-এর বাড়িতে আশ্রয় নেন। তারা তাকে পুত্রবৎ সেবা করে সারিয়ে তোলেন। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়।

সূত্র :জ-১১৫৮৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. সোহাগ হাওলাদার	**কমলেশ মণ্ডল (মুক্তিযোদ্ধা)**

সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: কলাতলা, পোস্ট: চিলাপুর
৮ম শ্রেণি, হলুদ শাখা, রোল: ৩৪০	থানা: মোংলা, জেলা: বাগেরহাট
মোংলা, বাগেরহাট	বয়স: ৫৬

তোর বাপ এসেছে

মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে এসে ১৯৭১ সালে আমাদের পরিবারের মধ্যে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। তখন ছিল ডিসেম্বর মাস অর্থাৎ শীতের শুরু। যেখানে সেখানে পাকহানাদার বাহিনীর গোলাগুলিতে নিরীহ বাঙালি মৃত্যুবরণ করছে।

দাদু মরার কয়েকদিন আগে দাদুদের বাড়ির উত্তর পাশের খালের ওপারে রাতে আগুন জ্বলতে দেখা গেল। আর করুণ কান্নার ধ্বনি শোনা গেল, বাঁচাও বাঁচাও করে। বাড়ির যুবকেরা তাদের রক্ষার জন্য যেতে প্রস্তুত হল। রাস্তায় বেরিয়ে শুনতে পেল এটা পাক হানাদার বাহিনীর আক্রমণ। ভয়ে কেউ আর যেতে সাহস পেল না। পরে দিনের বেলায় গিয়ে দেখা গেল সেখানে কয়েকটি লাশ পড়ে আছে। কারও মাথা নেই, কারও বুকে ছোরা বসানো, আর কিছু লাশ পুড়ে ঝলসে গেছে। ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সোনালি ধানের গোলা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এই করুণ দৃশ্য দেখা যায় না।

আমার বড় দাদু ছিলেন সহজ সরল মানুষ। বসে বসে কাঁদলেন। কেঁদে আর কী হবে? তাই সবাই রাতের বেলায় আর ঘরে ঘুমাতে পারে না। সবাই ধানের ভিতরে খুব কষ্টে ঠাণ্ডায় গা ঢাকা দিয়ে থাকে জীবন বাঁচানোর জন্য। তখন আমার বড় পিসির বয়স ছয় মাস। পিসি ঠাণ্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়ল। কিছুদিন পর ঠাণ্ডায় মারা গেল। পরে আমাদের গ্রামের দক্ষিণ পাশে ধান, টাকা-পয়সা, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল নিয়ে যেতে লাগল রাজাকারেরা। তারা বলল, এগুলো দে, তোদের কিছু হবে না। পাকবাহিনী আসত রাতের বেলায়। আর রাজাকারেরা খবর জেনে রাতের বেলায় এসে ঘর-দরজা জ্বালিয়ে লোক মেরে উল্লাস করত। মহিলাদের অনেক নির্যাতনও করত।

রাজাকারেরা যুবতীদের ধরে নিয়ে ক্যাম্পে চলে যায়। আমার বড় দাদু দ্বিগম্বর রায় সব সময় বলতেন, ওরা এসে সব নিয়ে যাক। আমি কোথাও যাব না। আমি বুড়ো মানুষ আমায় ওরা কিছু বলবে না। আমি বলব, তোমরা সব নিয়ে যাও বাপু। কিন্তু দাদুর ছেলেরা বলত, না বাবা, বাড়ি থাকা যাবে না। সবাই মিলে পালাতে হবে। ওরা বৃদ্ধ-যুবক দেখে না, মা-বোনও দেখে না, ওদের কাছে সবাই আমরা শত্রু। কিন্তু আমার দাদু বাড়ি থেকে এক পাও নড়তেন না। তার সব ছেলে-মেয়েরা কী আর করবে; পালাত সবাই।

আমাদের বাড়ির পাশে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। রাজাকারেরা তার খোঁজে প্রায়ই আসত। একদিন হঠাৎ রাতের বেলায় আমাদের বাড়ির কাছাকাছি চারটে-পাঁচটা ঘর পুড়িয়ে দিল। পাশের বাড়ির এক বুড়ি আধাপাগল। বুড়িকে ধরাধরি করেও কেউ নিতে পারল না। বুড়ি পাকবাহিনীর কাছে গিয়ে বলল, তোমরা আমার ধর্ম-বাবা, আমাগো বাড়ি আস। ওরা বুড়িকে বলল, যাব, বলে এক লাথিতে ফেলে দিয়ে বুকে ছোরা বসিয়ে বলল, এই যে ধর্ম-বাবা পড়ে থাক। তারপর একটা বাড়ি রেখেই আমাদের বাড়ি, সেই বাড়িটিও আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিল। এল আমাদের বাড়িতে। তখন আমার আর এক দাদু গাছের আগায় বসে দেখছিল ওরা বাড়িতে এসে কী করে। আমার বড় দাদু লেপ গায় দিয়ে শুয়ে ছিল। রাজাকারেরা ও পাকবাহিনী এসে দরজায় ধাক্কা দিল। দাদু বলল, কে? রাজাকারেরা বলল, দরজা খুলে দিয়ে দেখ তোর বাপ এসেছে। দাদু দরজা খুলে দিয়ে বলল, বাপুরা সব নিয়ে যাও, আমার শীত লাগছে, আমি শুয়ে পড়ছি। বলে লেপ গায় দিয়ে শুয়ে পড়ল। একজন রাজাকার বলল, আর একটা লেপ গায় দিয়ে দি? বলে আর দুটো লেপ গায় দিয়ে দিল। দিয়ে বলল, বাছাধন তোর ছেলেরা কোথায়? বুড়া সহজ ভাষায় বলে দিল, গেছে গিয়ে দেখগে ওই মুক্তিযোদ্ধার কলাবাগানে। বলে দাদু ঘুমিয়ে পড়ল। আবার একজন রাজাকার বলল, এই বুড়ো, কেরসিন তেল আছে? বুড়ো বলল, দেখতি খাটের নিচে। একজন রাজাকার আনন্দ বোধ করছে বুড়োর কথায়। তার পর কেরোসিন বের করে বুড়োর গায়ে ছিটিয়ে দিল।

দাদু তখন লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুম । টের পেল না । রাজাকারেরা ঘর থেকে বের হয়ে ঘরে দরজা দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিল । আমার ছোট দাদু গাছের আগায় বসে কাঁদতে লাগল । সকলে এসে দেখল দাদু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ।

সূত্র : জ-১১৬০৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সুপ্তি রায়	**সমীরণ রায়**
সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়	শেলাবুনিয়া, মোংলা, বাগেরহাট
৭ম শ্রেণি, রোল: ৭২০৬	বয়স: ৪৪ বছর, সম্পর্ক: পিতা

আমাদের কষ্ট অতি সামান্য

আমার আব্বা মৃত. বীর মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলী বিশ্বাস । আমার আব্বা বেঁচে থাকতে আমি তাঁর মুখ থেকে মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী অনেক শুনেছি । কিন্তু যখন শুনেছি তখন আমি ছোট ছিলাম, তাই আব্বার বলা যুদ্ধের কাহিনীগুলো আমার ভালভাবে মনে নেই । তবে আব্বা কোথা থেকে যুদ্ধ শুরু করেন এবং অন্য যেসব স্থানে যুদ্ধ করেন তার কিছু কিছু স্থানের নাম আমার মনে আছে ।

আমার আব্বা একজন হাবিলদার ছিলেন । আব্বা ২নং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর ১নং সেক্টর কালুরঘাট হতে মেজর জিয়াউর রহমানের কমান্ডে পরিচালিত যুদ্ধে প্রথম অংশগ্রহণ করেন । এরপর জিয়াউর রহমান বাঙালি সেনাদের ট্রেনিং দিয়ে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করেন । আব্বা চট্টগ্রাম, সিলেট চা বাগান, কুমিল্লা, শুভলং, ষোলশহরসহ আরো অনেক স্থানে যুদ্ধ করেছেন । আব্বা বেঁচে না থাকায় সব জায়গার নাম ও যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিত লিখতে পারলাম না ।

আমার এক কাকা আছে । তিনিও একজন মুক্তিযোদ্ধা । তাঁর নাম বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জলিল মুন্সী । তিনি মৌলভীবাজার, সিলেট, আশ্রমবাড়ি, চুনারুঘাট, মিরপুর, শাহজালালের মাজার, সুরমা ব্রিজ, শিংগারবিল, আখাউড়া এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেন । তিনি একজন সার্জেন্ট অফিসার ছিলেন । কাকা দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট হতে যুদ্ধ শুরু করেন । কাকা যে ব্যাটেলিয়ানে ছিলেন সেই ব্যাটেলিয়ন ছিল মেজর শফিউল্লাহর কমান্ডে পরিচালিত । কাকার মুখে শোনা তাঁর বিশেষভাবে স্মরণীয় একটি ঘটনা আমি উল্লেখ করছি:

সেদিন ছিল ডিসেম্বরের ১২ তারিখ রবিবার । কাকারা শিংগারবিল হতে তাদের ব্যাটেলিয়নের সবাইকে নিয়ে রওনা করেন আখাউড়ার উদ্দেশে । কাকারা রাত ৮টায় আখাউড়ায় পৌঁছান । তারপর সেই রাতে ১২টার সময় খবর পান যে একটা অপারেশনে যেতে হবে । সবাইকে তৈরি হতে বলা হল । সবাই তৈরি হয়ে নিল । কাকাদের ব্যাটেলিয়নে ১০০ জনের ঊর্ধে মুক্তিসেনা ছিল । সবাই তৈরি হয়ে অপারেশনের জন্য বের হল । কাকারা তাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেলে সবাই তার নিজ নিজ পজিশন নিল । কাকাসহ আরো ১০-১২ জন সেখানে ছিল । কাকা কমান্ড টু সি-এর দায়িত্বে ছিলেন । কমান্ডাররা নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে হানাদারবাহিনীর ক্যাম্পের উপর হামলা শুরু করে সৈন্যরা । কাকার পাশে একজন সার্জেন্ট অফিসার ছিলেন । তাঁর নাম সার্জেন্ট আশরাফ । কাকারা হামলা করার পর পাকিস্তানিরা পাল্টা হামলা করল । সেখানে কাকাদের সঙ্গে হানাদার বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয় । হানাদার বাহিনী বোম ছুঁড়তে লাগে । এক পর্যায়ে কাকাদের ব্যাটেলিয়নের ৭-৮ জন সৈনিক মারা যায় । কাকার কাছাকাছি যে সার্জেন্ট আশরাফ ছিলেন তিনি বোমার আঘাতে মারা গেলেন । বোমার আঘাতে তাঁর শরীর হতে দুটি পা আলাদা হয়ে যায় । কাকা ৩-৪ হাত মাটির নিচে চাপা পড়লেন । তিনি মনে মনে ভাবছিলেন তাকে হয়তো ওখানেই দম আটকে মারা যেতে হবে । কাকা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন ।

কাকাদের ব্যাটেলিয়ানের লোকেরা তাদের শহীদ ভাইদের লাশ সঙ্গে করে নেওয়ার জন্য লাশ তল্লাশি শুরু করে । তখন কাকার সেই সঙ্গী আশরাফের দুটি পা তাঁরা দেখতে পায় । পা দুটি মাটি সরিয়ে উঠিয়ে তাঁরা বুঝতে পারে যে সার্জেন্ট আশরাফের পা, কারণ তাঁরা ইতিমধ্যে তাঁর ছিন্ন দেহটি পেয়ে গিয়েছিল । তখন তাঁরা মনে করেন যে সার্জেন্ট আশরাফের সঙ্গে সার্জেন্ট জলিলও ছিল । পা দুটি যেখানে পেয়েছিল সেখানে মাটি খুঁড়ে কাকাকে

পান। তাঁরা দেখেন কাকা জীবিত আছেন। কাকার তখন জ্ঞান ফেরে; কিন্তু মাটির নিচে অনেকক্ষণ থাকার জন্য মাটির নিচ থেকে উপরে তোলা মাত্রই কাকার নাক-মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে শুরু করে। তখন কাকা আবারও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তারপর কাকার যখন জ্ঞান ফেরে তখন কাকা দেখতে পান যে, তিনি একটি তাঁবুর নিচে স্যালাইনরত অবস্থায় শুয়ে আছেন। ব্যাটেলিয়নের সৈন্যদের কাছ থেকে কাকা জানতে পারেন যে, তিনি তিন দিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর কাকার জ্ঞান ফেরে। এরই মধ্যে কাকার ব্যাটেলিয়ন যুদ্ধ করতে করতে কুমিল্লা ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে চলে গিয়েছিল।

কাকাকে চিকিৎসার জন্য ভারতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হলে কাকা বাধা দিয়ে বলেন তিনি সুস্থ আছেন। তিনি তাঁর দলে যোগ দিতে চান এবং তিনি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। ঐ দিনই তিনি কুমিল্লা গিয়ে তাঁর ব্যাটেলিয়নে যোগ দেন এবং যুদ্ধ শুরু করেন। কাকারা যুদ্ধ করতে করতে ডেমরার দিকে অগ্রসর হন।

১৬ ডিসেম্বর বিকাল ৪:৩০ মিনিটের সময় ঢাকার রমনা রেসকোর্সে মিত্রবাহিনীর ভারতের জেনারেল অরোরার কাছে পাকিস্তানের জেনারেল নেওয়াজী সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করে। তখনই কাকাদের যুদ্ধের অবসান ঘটে। আমরা পাই একটা স্বাধীন দেশ। এভাবেই নানা ধরনের কষ্টের মাধ্যমে নয় মাস যুদ্ধ করে শোষকদের হাত থেকে আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমিকে স্বাধীন করেছেন।

কাকা বলেছেন, কষ্টটা বড় কথা নয়। লক্ষ লক্ষ প্রাণের মূল্যে এবং আমাদের সামান্য কষ্টের বিনিময়ে যে আমরা একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি এটাই আমাদের জন্য বড় পাওয়া। আমাদের কারো অধীনে থাকতে হচ্ছে না। আমরা ইচ্ছামতো স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছি এটা যে কত বড় পাওয়া তা বলে শেষ করা যাবে না। এর কাছে আমাদের কষ্ট অতি সামান্য এবং বলতে গেলে কিছুই না। আমার দেশের জন্য যুদ্ধ করতে পেরে আমি গর্বিত।

সূত্র : জ- ১০৭৪৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
কানিজ খাদিজা	**জলিল মুন্সী**
দিগরাজ ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়	গ্রাম: খানবাড়ি, পোস্ট: কুয়েট
একাদশ শ্রেণি, রোল: ২২৯	থানা: খান জাহান আলী, জেলা: বাগেরহাট
	বয়স: ৬৪ বছর, সম্পর্ক: কাকা

অশ্রুসিক্ত হয় মো. দেলোয়ার হোসেন

সহকারী প্রধান শিক্ষক মৃত- ছোরমান উদ্দীনের পুত্র মো. দেলোয়ার হোসেন (বীর মুক্তিযোদ্ধা) ১৯৫২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাগেরহাটে জন্মগ্রহণ করেন। মো. দেলোয়ার হোসেন তখন দশম শ্রেণির ছাত্র। তিনি আমাদের ১৯৭১ সালের ঘটে যাওয়া হাজার কাহিনীর ভিতরে লাঞ্ছিত এক তরুণি মঞ্জুরাণীর গল্প বলেন।

বাগেরহাট সদরের রাধাপল্লব গ্রামের ডা. বলরাম-এর জ্যেষ্ঠ কন্যা ছিলেন মঞ্জুরাণী। ১৯৭১ সালে বাগেরহাট পি.সি কলেজের ডিগ্রি ২য় বর্ষের ছাত্রী। তখন বাগেরহাটের রাজাকার কমান্ডার এবং তৎকালীন পিস কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন রজব আলী ফকির। রজব আলী থাকত বাগেরহাট সুপারি পট্টি বিল্ডিং-এর ২য় তলায়। রজব আলী সর্বপ্রথম তৎকালীন বাগেরহাটের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী জমিদার কিরণ দাসকে হত্যা করে এবং কিরণ দাস বাগেরহাটে প্রথম রাজাকারদের হাতে মারা যান।

এরপর বাগেরহাটে বিস্তার পেতে থাকে রাজাকারদের প্রভাব। একের পর এক মানুষ হত্যা ও নারী ধর্ষণ করতে থাকে রাজাকাররা। তখন রাজাকারদের মধ্যে কুখ্যাত ছিলো পূর্ববাঁশবাটি গ্রামের রজব আলী ফকির, এনায়েত

রাজাকার, হাবিব, মজিবর এবং রাধাবল্লব গ্রামের রহমান শেখ। এদের মধ্যে হাবিব এবং মজিবর এখনও বেঁচে আছে। রাজাকাররা সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকদের হত্যা করত এবং নারীদের ক্যাম্পে উঠিয়ে এনে ধর্ষণ করে পরে গুলি অথবা জবাই করে হত্যা করত। এমনি একজন তরুণী মঞ্জুরাণী যিনি রজব আলী রাজাকারের শিকারে পরিণত হন। মার্চ-এর শেষের দিকে একদিন সন্ধ্যায় রজব আলী ফকিরের নির্দেশে এনায়েত রাজাকার, হাবিব, মজিবর এবং রহমান শেখ ও তাদের লোকজন মিলে মঞ্জুরাণীকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায়। মঞ্জুরাণীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে রাজাকাররা। তিন দিন পরে নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করে। রাজাকাররা ছুরি দিয়ে মঞ্জুরাণীর দুই স্তন কেটে ফেলে এবং শরীরের দুইটি স্থানে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। পরে মৃত মঞ্জুরাণীর ছিন্নভিন্ন শরীর ক্যাম্পের বাইরে ফেলে দেয়। বুকে পাথর বেঁধে মেয়ের লাশের ভার বয়ে মুখে আগুন দিতে হয় বাবা ডা. বলরামকে। মনের দুঃখে ভারতে চলে যায় ডা. বলরামের পরিবার। এমন বিবরণ দিতে গিয়ে অশ্রুসিক্ত হয় মো. দেলোয়ার হোসেন।

স্বাধীন হয় দেশ, কিন্তু হারাতে হয় মঞ্জুরাণীর মত হাজারও মায়েদের। কিন্তু মঞ্জুরাণীর মত মেয়েরা বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে আমাদের মনের গভীরে অনন্তকাল ধরে।

সূত্র : জ- ১০৭৪৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. আমিনুল ইসলাম দিগরাজ ডিগ্রী মহাবিদ্যালয় একাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান শাখা, রোল: ০৫	**মো. দেলোয়ার হোসেন** (বীর মুক্তিযোদ্ধা),

সেই হাতে খুব পিটালো

১৯৭১ সাল, সেই দিনটা আমার জীবনে একটা দাগ হয়ে রয়েছে। ১৯৭১ সাল থেকে যুদ্ধ শুরু হয়। রাতে আমরা সবাই ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন হঠাৎ শুনি কামান ও গোলাগুলির শব্দ। আমি আমার ছেলেকে বাঁচানোর জন্য পাকিস্তানিদের ভয়ে পাড়া প্রতিবেশীদের এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে নৌকায় করে নদী পার হলাম। এ দিকে পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের দেখতে পেয়ে আমাদের পিছু নিল। যখন আমরা সবাই নৌকা দিয়ে নামতে গেলাম তখন পাক বাহিনী এসে পড়ল। তখন অনেক মা তার সন্তানকে আনতে পারেনি– সেই নৌকায় রেখে এসেছে পাকিস্তানিদের ভয়ে। তখন আমি আমার ছেলেকে বাঁচানোর জন্য এক ঘরে আশ্রয় নিলাম। এদিকে কামান দিয়ে সবার ঘর পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। আবার পাকিস্তান বাহিনী যা ঘরে পেয়েছে তাই নিয়ে এসেছে।

আমরা সবাই মিলে যে ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেই ঘরে আমাদের এক পাকিস্তানি দেখে ফেলল আর কয়েক পাকিস্তানিকে খবর দিল যে, এই ঘরে কয়েকজন আছে। সঙ্গে সঙ্গে পাক বাহিনী আমাদের উপর আক্রমণ করল। অনেক মহিলার উপর নির্যাতন করল। তখন এক উঁচা লম্বা পাকিস্তানি এসে আমাকে খুব মারল। আমার ছেলেকে আমার বুকে শক্ত করে চেপে ধরলাম। তারপর পাকিস্তানিটা আমার ছেলেকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিতে গেল। তখন আমার ছেলেকে শক্ত করে ধরে রাখলাম বুকে। তখন পাকিস্তানি বাহিনী যে হাত দিয়ে আমার ছেলেকে চেপে ধরে রেখেছিলাম বুকে, সেই হাতে খুব পিটালো। তখন আমার হাত থেকে ছেলে পড়ে গেল। আর আমার হাত এমনভাবে পিটালো যে, হাত ভেঙে ফেলল। তখন আমার ছেলেকেও খুব মারল। আমার ছেলে মরে যাওয়ার মতো অবস্থা। তখন আমি হাত দিয়ে ছেলেকে ধরতে পারিনি। তখন এক মহিলা এসে আমার ও আমার ছেলের দেখাশুনা করল। তারপর অনেক কষ্ট করার পর হাত ভালো হল।

তখন ভাবলাম, আবার পাকবাহিনী এখানে আসতে পারে, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লাম, আর ভাবলাম যে, একবার পাকিস্তানিদের হাত থেকে জীবন রক্ষা পেয়েছি, এবার আর পাব না। তাই ভেবে সন্তানকে শক্ত করে বুকে নিয়ে ছুটলাম।

ওদিকে দেখি যে, একই সাথে বাবা ও ছেলেকে খুন করল পাকিস্তানিরা এবং এক কবরে দুই জনকে কবর দিল। আর একদিকে দেখি যে, মায়ের কোল থেকে সন্তানকে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করল। আমি ভয় পেয় আরো ছুটলাম।

সবার মুখে শুনি দেশ স্বাধীন হয়েছে। আর আমার স্বামীকে যেই হত্যা করতে গেল তখন দেশ স্বাধীন হল। আমরা ৩০ লক্ষ রক্তের বিনিময়ে এই প্রিয় স্বাধীনতা পেয়েছি এবং তারপর আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। এই যুদ্ধের ঘটনা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সূত্র : জ-১১৬২৩

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
নিপা আক্তার	**লালমন বিবি**
সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়	সৈনিক কলোনী, মোংলা, বাগেরহাট
৭ম শ্রেণি	বয়স: ৭৫ বছর, সম্পর্ক: নানি
মোংলা, বাগেরহাট	

দক্ষিণ বাংলার 'শেখ মুজিব'

১৯৭১ সাল। ডিসেম্বর মাস। আমাদের বিজয়ের মাস। গর্বের মাস। স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার মাস। সারা বিশ্বের দরবারে বাঙালিরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে। সব সেক্টরেই পাকবাহিনীর পতন শুরু হয়েছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রসহ বিবিসি প্রচার করে চলেছে বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকবাহিনীর পতনের খবর। এমনি এক সময়ে আকাশে বাতাসে খবর ছাড়িয়ে পড়ে যে, পাকিস্তানি সেনারা দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর চালনা (বর্তমানে মোংলা) দিয়ে বিদেশি জাহাজে করে বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। যৌথ বাহিনীর (ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের মিলিত বাহিনী) বিমান বাহিনী সিদ্ধান্ত নিল তাদের ধ্বংস বা প্রতিরোধ করার। এদিকে মুক্তিপাগল মোংলা এলাকার মুক্তিযোদ্ধাগণ মোংলা বন্দরে এসে একে একে জড়ো হতে লাগল।

এলএমডি অফিসে (বর্তমানে মোংলা থানা) এসে অবস্থান নিল। এদের মধ্যে ছিলেন দক্ষিণ বাংলার ''শেখ মুজিব'' খ্যাত মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, যার প্রচেষ্টায় এই এলাকায় গড়ে উঠেছিল আওয়ামী লীগের মজবুত সংগঠন, যার অক্লান্ত আন্তরিক প্রচেষ্টায় মোংলা এলাকার ৯৫% মুক্তিযোদ্ধা সংগৃহীত বা রিক্রুট হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করছিল, যার নেতৃত্বে পাকিস্তানের শেষের দিকে (১৯৬০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত) এককভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো এই এলাকা, আমাদের প্রিয় নেতা খেগড়াঘাটের গাজী আ. জলিল। আর একজন ছিলেন ভারতের দেরাদুন সামরিক ক্যান্টনমেন্ট থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণকারী রামপাল থানার (বর্তমানে মোংলা ও রামপাল) থানা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আ. জলিল। কাকতালীয়ভাবে দুইজনের নামই জলিল। আমাদের এই ৯ নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডারের নামও মেজর আ. জলিল। এছাড়া আরও পঞ্চাশ/ষাটজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তারা হলেন চাঁদপাই ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বিশ্বাস অমরেন্দ্র, মহানন্দ মণ্ডল, রিচার্ড অরূপ হালদার, আন্তনী ভাগ্য সরকার, পীযুষ হালদার, রণজিৎ হালদার, নারায়ণ হালদার, স্টিফেন মৃধা, মনির আহম্দ খান আলম, মতিলাল বিশ্বাস, মো. আ. ওয়াদুদ, আন্তনী রমেশ হালদার, ম্যাথুয়েস দিগবিজয় নাথ, মো. হাসান আলী শেখ, প্রভাস বিশ্বাস, মো. ইউনুছ আলী, আ. সালাম, শাহাজাহান সরদার, সমরেন্দ্র মিস্ত্রী, ডা. ভিক্টোর সরদার, ক্ষিতিশ

সরকার, জিন্নাত হাওলাদার, অনন্ত মিস্ত্রী, সরদার আ. মান্নান, কমলেশ মণ্ডল, সামছুর রহমান ইজারাদার, বিশ্বাস রনজিৎ কুমার, মন্মথ বিশ্বাস, সুরেন মণ্ডল, নিমাই অধিকারী, নরেন সরকার, লরেন্স কুমুদ সরকার, দেবপ্রসাদ সরকার, জগদীশ মণ্ডল, নীরেন অধিকারী, সমরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ছাড়া আরও অনেকে।

সেদিন ৯ ডিসেম্বর। কেউ দুপুরে রান্নার আয়োজন করছে। কেউ বাজার করতে গেছে। কেউ দোতলায় পজিশন নিয়ে সতর্ক পাহারায় নিয়োজিত। কেউ অতি উৎসাহিত হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের ফেলে যাওয়া খাদ্য বহন করার জন্য ব্যবহৃত খালি ট্রাকখানা টেনে এনে এলএমডি অফিসের সামনে রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে রেখেছে। সবে মাত্র বাজার থেকে অন্যান্য জিনিসপত্র এনে রেখে কয়েকজন দোতলায় আলাপ আলোচনা করছে।

এর মধ্যে একখানা ভারতীয় প্লেন একটু নিচু হয়ে এলএমডি অফিসের উপর দিয়ে উড়ে গেল। কেউ কেউ উৎসুক হয়ে দেখার চেষ্টা করছে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্লেনখানা আবার ফিরে এসে রাস্তার উপর দাঁড় করানো খালি ট্রাকটি লক্ষ্য করে বোম্ব ফেলে চলে গেল সোজা পশ্চিম দিকে। থর থর করে এলএমডি অফিস কেঁপে উঠল। চারিদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। হতভম্ব সবাই যে যেদিকে পারলো ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে। অধিকাংশ লোক পশ্চিম পাশে পশুর নদীর চরে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে লুকানোর চেষ্টারত। ভাগ্য ভাল বলতে হবে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বোম্বটি রাস্তার উপর ট্রাকে না পড়ে পড়েছে পাশের একটি ডোবা গর্তে। তাই এ যাত্রা সবাই বেঁচে গেল। তা না হলে ঐ দিন মোংলা এলাকার অধিকাংশ বীর মুক্তিযোদ্ধা চূড়ান্ত বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে চিরতরে হারিয়ে যেত। বোম্বটি মাটির অনেক গভীরে গিয়ে ফেটেছিল। তবুও রাস্তা ভেঙে উঁচু হয়ে গেছে। এলএমডি অফিস ফেটে গেছে। আশেপাশে কম বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

পরদিন ১০ ডিসেম্বর। ঢাংমারীর কাছে পশুর নদীতে (বর্তমানে ৮ নং বয়া) ডেনমার্কের একটি জাহাজ নোঙর করা। জাহাজটির নাম এমভি লর্ডপুল। চাল নিয়ে এসেছিল। ৩৪ জন ক্রু। এ্যাকোমডেশন অর্থাৎ থাকার জায়গা ছিল পিছনের দিকে। সামনের দিকে মাল বহন করার হোল্ড। হঠাৎ করে একখানা ভারতীয় বিমান এসে নিচু হয়ে জাহাজের সামনের দিকে আঘাত হেনে চলে গেল। আবার ঘুরে এলো বিমানখানা। আবার আঘাত হেনে চলে গেল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ক্রুরা পাইপের জল দিয়ে ব্যর্থ চেষ্টা করছিল জাহাজের আগুন নেভানোর। লার্সছেন নামে একজন ক্রুর গায়ে স্প্রিনটারের আঘাত লেগেছিল। তবে জাহাজের পিছনে দিকে আঘাত না করায় সবাই বেঁচে গেল। ভয়ে তারা 'সেভ আস সেভ আস' বলে চিৎকার করছিল।

ঐ সময়ে চাঁদপাই ইউনিয়ন কমান্ডার অমরেন্দ্র বিশ্বাস ও মহানন্দ মণ্ডল চরকানার ইসমাইল সাহেবের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের মনটা ওদের বিপদে বিচলিত হয়ে উঠল। তারা নদীর দিকে এগিয়ে গেল। চরে দেখতে পেল একটা ছোট নৌকা বাঁধা। কোন লোকজন নেই। মাছধরা জেলে নৌকা সম্ভবত । জীবন বাজি রেখে ওরা দুইজন কোনভাবে একখানা ভাঙা বৈঠা বেয়ে জাহাজের গায়ে গেল। জাহাজে উঠে পরিচয় দিল তারা মুক্তিযোদ্ধা। জাহাজীরা ভয় পাচ্ছিল। দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল। এদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎ করে আবার প্লেনটি এসে আর একবার আঘাত হেনে চলে গেল। সবারই ভাগ্য ভালো, এবারও জাহাজের সামনের দিকে আঘাত হেনেছে। সময় নষ্ট না করে ক্যাপ্টেন সিদ্ধান্ত নিল ওদের সঙ্গে নেমে আসবে। তাড়াহুড়া করে নেমে এলো সবাই লাইফ বোটে।

তাদের এনে রাখা হল সেন্ট পল্‌স ক্যাথলিক মিশনে। মিশন প্রধান পালক পুরোহিত ফাদার তোমজ্জেলী। ইটালির অধিবাসী। খুব চমৎকার মানুষ। এদেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য সামাজিক উন্নয়নে নিবেদিত প্রাণ। সুদূর ইটালিতে আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ফেলে এই অজপাড়াগাঁয়ে এসে মিশে গেছেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তার অবদান চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণীয় হয়ে থাকবে এদেশের আপামর জন-মানুষের কাছে। এখানে আছে একটি দৃষ্টিনন্দন বিরাট গির্জা। সেন্ট পল্‌স উচ্চ বিদ্যালয়, সেন্ট পল্‌স হাসপাতাল। এখানেই একটি বিল্ডিং-এ থাকার ব্যবস্থা হল জাহাজীদের। ১৪ দিন ছিল তারা চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত। থাকা খাওয়াসহ সব রকম ব্যবস্থা করছিলেন জনদরদী ফাদার তোমাজ্জেলী। ১৬ ডিসেম্বরে চূড়ান্ত বিজয়ের পর যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হলে জাহাজীদের খুলনা হয়ে কলকাতা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল ওদের দেশে (ডেনমার্ক) ফিরে যাওয়ার জন্য। ওই জাহাজের

ক্যাপ্টেন তাদের বাঁচানোর জন্য অমর ও মহানন্দ বাবুকে ত্রিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল। ওরা নেয়নি সে টাকা। ওরা তো টাকার জন্য মুক্তিযুদ্ধে যায়নি, গিয়েছিল দেশকে স্বাধীন করতে। এদেশের মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে। দেশে ফিরে গিয়ে জাহাজীরা তাদের কোম্পানিকে বলেছিল বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কোম্পানি এই দুইজনকে ওই কোম্পনির জাহাজে চাকরি করার অফার দিয়েছিল। অমর বিশ্বাস গিয়েছিলেন চাকরি করতে। এখন তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে ভালো আছেন। মহানন্দ মণ্ডল তখন যাননি। গিয়েছিলেন কয়েক বছর পর। তিনিও ভালো আছেন।

সূত্র : জ-১১৬৩০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সৌরভ বিশ্বাস শুভ	**বিশ্বাস রণজিৎ কুমার**
সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: ব্রাহ্মণমাঠ, পোস্ট: শেলাবুনে
ষষ্ঠ শ্রেণি, রোল: ৬৪১২	থানা: মোংলা, জেলা: বাগেরহাট
শেলাবুনিয়া, মোংলা, বাগেরহাট	বয়স: ৬০, সম্পর্ক: বাবা

সুন্দরী লাড়কি চাইতো

১৯৭১ সালে সারা বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রমনা রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চের ভাষণ সমগ্র বাঙালিদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি আমার এই ভাষণকে স্বাধীনতার ঘোষণা বলে মেনে নিয়ে পশ্চিমা হানাদারদের নির্মূল করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবে। এরপর শুরু হয় স্বাধীনতার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে স্বেচ্ছায় অংশ নেয় বাংলার দামাল ছেলেরা, মেয়েরা। চলে দীর্ঘ নয়টি মাস গেরিলা যুদ্ধ। এই গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেন ভারতের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এম এ রাজ্জাক, যিনি তার দুঃসাহসিক গেরিলা যুদ্ধের কথা খুলনা বেতারে সাক্ষাৎকার আকারে দিয়েছিলেন এবং তার এই সাক্ষাৎকার বেতার থেকে ৬/৭ বার প্রচার করে মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার নামক অনুষ্ঠানে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে খান সেনারা জোর করে পশ্চিম পাকিস্তানে ধরে নিয়ে যায়। এরপর শুরু হলো তার ৭ মার্চের ঘোষণা অনুযায়ী মুক্তির সংগ্রাম। আমার বড় চাচা তখন ছাত্রলীগের সভাপতি। পাঁচগাঁও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির ছাত্র। এদেশের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নানা স্থানে নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে লাগলেন আমাদের নিজ এলাকা থেকে। প্রত্যেক লোকেরই চোখে মুখে যেন একটা চরম উদ্বেগের ছাপ। বিশেষ করে বেশি হতাশা দেখা দিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। কখন যেন কি ঘটে যায়। দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে সকলের দিন কাটতে লাগলো।

হঠাৎ করে বড় চাচা শুনতে পেলেন বাগেরহাট থেকে কুখ্যাত রজ্জব আলী ও আকিজ উদ্দিনের বিরাট রাজাকার বাহিনী আমাদের পাশের গ্রাম লক্ষ্মীখালীর বিখ্যাত গোপাল সাধুর বাড়িতে আক্রমণ চালায়বে। তারা বাড়ির তিন দিক থেকে ঘিরে বাড়ির ভিতর প্রবেশকালে বড় চাচা ছোট চাচাসহ আরো অন্যান্য প্রায় ৫/৬ জন লোক বাড়ির পূর্বদিক থেকে ওদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। ওদের কাছে বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র থাকায় বড় চাচার দলবল বেশি সময় থাকতে পারলেন না। তারপর বাড়ির মধ্যে হানাদাররা প্রবেশ করে প্রথমে লুটপাট চালায় ও লোকজনদের হত্যা করে। পরে প্রত্যেকটা ঘরে অগ্নিসংযোগ করে দিল। ঘরগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো। তার মধ্যে ওরা উল্লাসের সাথে নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে।

সাধুবাড়িসহ ঐ এলাকার প্রায় অর্ধশত মানুষকে তারা হত্যা করলো। তার মধ্যে উল্লেখ্য এক মতুয়া গোঁসাই সাধুর ছবিটিকে প্রণাম করা অবস্থায় হানাদার বাহিনী তার পিঠের দিক হতে লম্বা এক ছোরা এপিঠ ওপিঠ করে

দিলো। কিন্তু অবাক ব্যাপার ঐ গোঁসাই একই অবস্থায় পড়ে থাকলো, একটু নড়লো না। এলাকাটা আজও আছে। হানাদার চলে যাবার পর মৃতদের সাধ্যমতো সৎকার এবং যারা কোন রকমে বেঁচে থাকলো বড় চাচা তার দলবল নিয়ে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

এরমধ্যে সাধু বাড়ির উত্তর পূর্বদিকে ২০/২৫টি পরিবারের বসত বাড়িতে ঢুকে অনুরূপ লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন এবং হত্যা করে যাবার সময় প্রায় ২/৩টি যুবতী কুমারী মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়, যাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের সময় একটি ৮/১০ বছরের ছেলেকে এমনভাবে কোপ দিয়েছে ছেলেটার নাড়িভুড়ি সব ঝুলে পড়ে। মরার মত ঘরের এক কোনে প্রায় তিন দিনের মত পড়ে থাকে। পোড়া ঘর দেখার জন্য ও অন্যান্য খোঁজ খবর নেবার জন্য বড় চাচা ঐ এলাকায় গেলে আহত অবস্থায় ঐ ছেলেটির সন্ধান পান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ভারতে পাঠানো হয়। সেই ছেলেটি আজও বেঁচে আছে। এরই সাথে আহত আরেক জনকেও ভারতে পাঠানো হয়েছিল। আহতদের মধ্যে এ দুজনার অবস্থা দেখে বড় চাচা প্রতিজ্ঞা করেন জীবন দিয়ে হলেও হায়েনাদের কাছ থেকে দেশকে স্বাধীন করবোই ইনশাহ আল্লাহ।

তারপর এলাকার কয়েকজনকে নিয়ে ভারতের বিহারে ট্রেনিং শেষে এসে নানা জায়গায় হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন হবে হবে এমন সময় বড় চাচা খুঁজতে লাগলেন সেই রজ্জব আলী এবং জল্লাদ আকিজুদ্দিনকে। যখন তারা বাগেরহাটে সশস্ত্র অবস্থায় লঞ্চ নিয়ে আসলেন ততক্ষণে অনেক কিছুই শেষ হয়ে গেছে। রজ্জবালী স্বাধীন বাংলাদেশ দেখবে না বলে হাতের হীরার আংটি মুখে দিয়ে চুষে বাগানের মধ্যে গিয়ে আত্মহত্যা করে। এখানেই শেষ নয়। তার আত্মহত্যার পর লোকজন তার দুপায়ে রশি বেঁধে বাগান থেকে টেনে রাস্তায় নিয়ে আসে। সেখান থেকে গলায় রশি লাগিয়ে বাগেরহাট ডাক বাংলোর সামনে দুপায়ে মোটা রশি বেঁধে পা দুটো উপরের দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে মাথায় পাকিস্তানি পতাকা বেঁধে রাখে। গলায় ঝাটা ও জুতার মালা, এই অবস্থায় অনেক দিন রাখা ছিল। হাজার হাজার মানুষ তা প্রত্যক্ষ করেন মনের আনন্দে।

এই কুখ্যাত রজ্জবালী ও আকিজদ্দিনের আরও দোসর ছিল। আমাদের এলাকায় আজও জল্লাদ হিসেবে পরিচিত মোসলেম ফরাজী। তার কাজ ছিল রাজাকার আলবদর ও খান সেনাদের ধৃত নিরীহ লোকদের ক্যাম্প থেকে নিয়ে যাওয়া মোরেলগঞ্জ বাজারের নদীর পাড়ের পন্টুনে। সেখানে দাঁড় করিয়ে এক জনের গলায় এক এক পোচ দিত ধারালো ছোরা দিয়ে । তারপর লাথি মেরে নদীতে ফেলে দিত। এভাবে সাধারণ মানুষকে মুক্তিযোদ্ধা বলে ধরে এনে নানাভাবে অত্যাচার ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যার পর উল্লাস করতো।

নরপিশাচের দল রাজাকার আলবদর খান সেনারা তাদের ক্যাম্পে এলাকা থেকে মহিলাদের ধরে এনে অমানুষিকভাবে নির্যাতন চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে খাল-বিলে ফেলে দিত। সেসব লাশ শিয়াল কুকুরে খেত। বিনিময়ে রাজকাররা পেত খান সেনাদের কাছ থকে বখশিস।

এই নির্মম পিশাচের দল আজও স্বাধীন বাংলার মাটিতে দম্ভভরে জীবনযাপন করছে। আর স্বাধীনতার সূর্য সৈনিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে, অথচ এদের কোন বিচার হচ্ছে না। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সোনার ছেলেরা আজ যেখানে সেখানে অপমানিত হচ্ছে। অসহায় দ্বারে দ্বারে অনেকে ভিক্ষা করছে। আজ তাদের চরম দৈন্যদশা।

হানাদারদের হত্যাযজ্ঞ চলাকালে মোংলায় ৩ জন ধরা পড়ে। এদেরকে এক সঙ্গে পুলের উপরে দাঁড় করিয়ে গুলি করে। দুই জন পানিতে তলিয়ে গেলেও মো: আব্দুল কুদ্দুস হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ভাসতে ভাসতে চরে গিয়ে ওঠে। পরে স্থানীয় জনগণ দেখে গোপনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। বর্তমানে আ. কুদ্দুস মোংলা থানা কমান্ডের সদস্য। তার গুলি লেগেছিল গলার এক পার্শ্বে। খান সেনারা স্থানীয় রাজাকারদের কাছে সুন্দরী লাড়কি চাইতো আর লাড়কি যোগাড় করে দিতে না পারলে অনেক রাজাকারকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। এ ধরনের অনেক প্রমাণ রয়েছে।

কালেখারবেড় এলাকায় ভীষণ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে খান সেনা, রাজাকার, বিহারি, মিলিশিয়া অনেক হানাদার আহত হয়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা ছিল মাত্র ৮০ জনের মত। তিন দিক দিয়ে ঘিরে ওরা যুদ্ধ করে। বহু হানাদার এ যুদ্ধে আহত হয়ে অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেলে রেখে চলে যায়। পরে ঐ এলাকা থেকে পিস কমিটির লিডার

হাদি মল্লিককে ধরা হয় এবং কয়েকদিন ক্যাম্পে রাখার পর তার কাছ থেকে নানা তথ্য জানার পর তাকে মেরে ফেলা হয়।

সূত্র : জ-১১৬৩১

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
আশিকুর রহমান	**ডা. এম এ রাজ্জাক**
সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: কেওড়াতলা, পোস্ট: মোংলা
ষষ্ঠ শ্রেণি	থানা + জেলা: বাগেরহাট
মোংলা, বাগেরহাট	বয়স: ৫৫ বছর, সম্পর্ক: পিতা

শব-ই-বরাতের সময়

১৯৭১ সাল। বাংলা আশ্বিন মাস। শব-ই-বরাতের সময়। বটিয়াঘাটা থানার বিরাট গ্রাম নিবাসী কমান্ডার আফজাল শতাধিক সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে কালেখারবেড় দীঘির পাড় নামক স্থানে বাংকার বা ঘাঁটি করে চারিদিকে অবস্থান করে আছে। বিভিন্ন জায়গায় তারা রাজাকারদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করেছে। এই খবর পাক হানাদার বাহিনী ও রামপাল বাগেরহাটের রাজাকাররা পায়। তিন চারদিন অবস্থানের পর একদিন সকাল ১০টার দিকে মুক্তিযোদ্ধারা পশুর নদী দিয়ে মইদাড়া নদী থেকে সলতেখালি খাল দিয়ে দীঘির পাড়ে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে পৌঁছলে হঠাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গানবোট থেকে আক্রমণ করে পাকহানাদার বাহিনী। তখন মুক্তিযোদ্ধারা পাল্টা আক্রমণ করে। মেশিনগানের শেলিংগুলো দীঘির পাড় অতিক্রম করে বিস্ফোরণ হতে লাগল। তাতে মুক্তিযোদ্ধাদের কোন ক্ষতি হলো না। তবে পাক হানাদার বাহিনী গানবোট থেকে নেমে কিছু ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ইয়ালি আল্লাহু-আকবর ধ্বনি দিতে থাকে। সাহসি মুক্তিযোদ্ধারা তখন আগুন লাগা বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং হানাদার বাহিনীর উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়তে থাকে। তারা অনেকেই আহত হয়। অবশেষে গানবোট নিয়ে দীর্ঘ তিন ঘন্টা যুদ্ধের পর তারা ফিরে যায়। কিন্তু গানবোটের কোন ক্ষতি মুক্তিযোদ্ধারা করতে পারল না।

দুই দিন পর রামপাল বাগেরহাটের রাজাকার আলবদর এবং পাক সেনারা যৌথভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করার জন্য আসে। তখন মুক্তিযোদ্ধারা সার্বিকভাবে প্রস্তুত ছিল। মুক্তিযোদ্ধা সুদাস তার বাইনোকুলার নিয়ে দীঘির পাড়ের বটগাছের মাথায় উঠে রাজাকারদের আসবার পথের দিক লক্ষ্য করছিল। সেই অনুসারে রাজাকাররা বটবুনিয়া বাজারের উপর দিয়ে ভগারহাটের নিকট কাঠের ব্রিজের উপরে উঠে। মুক্তিযোদ্ধারা তখন হালকা মেশিনগান দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে। তাতে রাজাকাররা কয়েকজন নিহত হয়। তখন শুরু হয়ে যায় তুমুল যুদ্ধ। ইজার্দার বাড়ির আড়াল থেকে রাজাকাররা গুলি করে। তখন মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন বাড়ির আড়াল নিয়ে সামনে এগুতে থাকে। তারপর রাজকারদের লক্ষ করে গুলি ছোড়ে। ওই গুলিতে আরও কয়েকজন রাজাকার নিহত হয় এবং অধিকাংশ রাজাকার আহত হয়। পরে তারা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য লাশ নিয়ে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধ প্রায় ৪ ঘন্টারও বেশি স্থায়ী হয়। যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের কেউই আহত বা নিহত হয় না।

উল্লেখ্য যে, মুক্তিযোদ্ধারা দাকোপ থানার বাজুয়া থেকে রাত্রি বেলায় নৌকা যোগে যখন পশুর নদী পার হয় তখন গানবোট থেকে নৌকার দিকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে হানাদার বাহিনী। রামপাল নিবাসী ঝনঝনিয়া গ্রামের ইউসুফ-এর হাতের কনুইয়ের উপর গুলি লাগে। তাকে দীঘির পাড়ের এক গ্রাম্য ডাক্তার ওদুতকে দিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। চিকিৎসা করিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। আমি নিজের হাতে তাকে ইউনিয়ন পরিষদের পাশে বাঁশ বাগানের নিচে সমাধিস্থ করেছিলাম। তার সমাধি সাবেক ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী তালুকদার আব্দুল

খালেক পাকা করে রেখেছেন। ওই অনুষ্ঠানেও আমার উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই যুদ্ধকালীন আমার সহযোদ্ধা হচ্ছে-

দিলীপ সরদার, সুদাস মন্ডল, গুরুদাস, হরেন,কামরুল, মকবুলসহ আরো অনেকে।

রামপালের কালেখারবেড় দীঘির পাড়ের যুদ্ধ শেষে আমরা এক রাত্রে শতাধিক মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ফয়লার পথ দিয়ে ভরসাপুর হয়ে চুলকাঠি বাজারে যাই। তখন সকাল ৮টা। প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হয়ে বাজারের চিড়া মুড়ি যা ছিল সেগুলো আমরা খেয়ে ফেলি। ওখান থেকে আমরা ঘনশ্যামপুর স্কুলে গিয়ে অবস্থান করি। স্কুলটি ছিল দোতলা ভবন। তার সামনে একটি প্রাইমারি একতলা ভবন ছিল। সবাইকে ওখানে রেখে আমরা ৫ জন মুক্তিযোদ্ধা মিলে খাবারের উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যানের বাড়ির দিকে যাই। কিছুদূর যাওয়ার পর খবর পেলাম রাজাকাররা আমাদের অনুসরণ করছে। খাবার আনতে আর যাওয়া হল না। তারপর একটা পুকুর পাড়ে তাদের দেখতে পেলাম। দেখতে পেয়ে আমরা স্কুলে ফিরে এসে সবাইকে পজিশনে যাওয়ার কথা বললাম। তড়িঘড়ি হয়ে চারিদিকে মুক্তিযোদ্ধারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে লাগল। আমি আরো ৫ জনসহ দুই স্কুলের মাঝখান দিয়ে পাশে এক বাড়ির উঠানে পৌঁছলাম। পৌঁছানোর সাথে সাথে দেখলাম মাত্র কয়েক হাত দূরে রাজাকার বাহিনীর লোক। সাথে সাথে তারা আমাদের দিকে গুলি ছুড়তে শুরু করল। একটি গুলি আমার পাশে আমার সহযোদ্ধা রামপাল থানার ঝনঝনিয়া গ্রাম নিবাসী মনসুরের উরুতে লাগল। তাৎক্ষণিকভাবে আমরা পজিশন নিয়েই তাদের দিকে গুলি ছুড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ শুরু হল। রাজাকারদের সঙ্গে পাক সেনারাও ছিল। আমাদের নিকট এলএমজি, এসএলআর, গ্রেনেড ছাড়া রাইফেল, এবং টুইঞ্চ মর্টার ছিল।

আমরা আফজাল ভাইকে নিয়ে স্কুলের ছাদের উপরে গিয়ে মর্টারের গোলা ছুড়তে লাগলাম। মর্টারের গোলায় হানাদার বাহিনীর অনেকেই আহত হল। আমাদের কমান্ডার আফজাল ভাইয়ের হাঁটুতে গুলি লাগল। আবার আমার সহযোদ্ধা শান্তি নামক এক মুক্তিযোদ্ধার হাতে গুলিবিদ্ধ হল। বেলা ১১টা হতে রাত দশটা পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ হয়। আমরা ক্রসিং ফায়ার করে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে স্কুল থেকে বের করে দিতে লাগলাম। সবাইকে বের করার পরে আহত কমান্ডার আফজাল-সহ আমরা ১০ জন সর্বশেষে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসি। দুর্ভাগ্যের বিষয় আহত মনসুরকে কোন ভাবেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আমরাও শতাধিক মুক্তিযোদ্ধারা সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই। কিছুদিন পরে আমরা খবর পাই আহত মনসুরকে রাজাকাররা এক ব্রিজের উপরে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। মনসুরও দেশের জন্য হল শহীদ।

সূত্র : জ-১০৮৮৯

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
বিপাশা গাইন	**নিখিল চন্দ্র রায়** (মুক্তিযোদ্ধা)
দিগরাজ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রাম: বুড়িরডাঙ্গা, পোস্ট: দিগরাজ
৯ম শ্রেণি, ব্যবসায় শিক্ষা শাখা, রোল-০৬	থানা: মোংলা, জেলা: বাগেরহাট
	সম্পর্ক: পিসেমশাই

আপনারা দুই লাইনে দাঁড়ান

খান সেনাদের বন্ধু হিসেবে এদেশের কিছু মানুষ রাজাকার হয়েছিল। তারা বাংলার নিরীহ মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার শুরু করল। খুন খারাপি লুটপাট আরম্ভ করল। পথে ঘাটে যেখানে যাকে পায় তাকেই তারা খুন করে। তাতেও তাদের হিংস্র স্বভাবের পরিবর্তন আসে না। ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে লাগল।

আমার দাদু একজন নিরীহ কৃষক তার নিজস্ব এলাকার কাহিনী বলেছে। রাস্তার পাশেই আমার ঘর, সে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমার দাদু তার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে নিয়ে নৌকা যোগে নর্নিয়া বিলের ভিতর ঘর ছেড়ে পালায়। তার মধ্যে শুরু হয়ে যায় বন্দুকের আওয়াজ। আগুনের ধোঁয়া দেখা গেল। রাজাকাররা গৃহে আগুন দিয়েছে বুঝতে বাকি রইল না। আমার দাদুর বাবা ও কাকা দুই ভাই। আমার দাদু পানির ভিতর কচুরিপানার মধ্যে লুকিয়ে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে থাকে। কোন কোন দিন আমি অনাহারে কাটিয়েছিলাম। সে সব কথা যখন মনে পড়ে চোখের জল বাধা মানে না। মা বাবা ভাই বোনদের নিয়ে কত কষ্টে বেঁচে ছিলাম। তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। রাজাকার আলবদর ও খানদের মুখে একটি মাত্র বুলি ছিল, এদেশ থেকে হিন্দু ওঠাও। রাজাকাররা খানসেনাদের সঙ্গে করে হিন্দুপল্লী দেখিয়ে দিত এবং ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিত। আমার দাদুর বৃদ্ধ পিতা এহেন অবস্থা দেখে আতঙ্কে প্রাণ হারায়। আত্মীয়-স্বজনেরা কে কোথায় আছে কে জানে, কে কার খোঁজ নিবে।

দিনের বেলায় বিলের ভিতর নৌকায় থাকতেন। রাত্রিকালে গ্রামের কাছে আসতাম। কিন্তু এসেই বা কি হবে। ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গরু বাছুর থালা ঘটি বাটি লুটেরা লুট করে নিয়ে গেছে। শূন্য ভিটা হাহাকার করছে। কি খেয়ে প্রাণে বেঁচে থাকবো তার কোন ব্যবস্থা আছে কি? লুটেরা সব নিয়ে গেছে। বিলের শাপলা তুলে সিদ্ধ করে খেয়ে কোন রকমে বেঁচে আছি। শুধু যে আমি কষ্ট করে বেঁচে আছি তাই নয়। আমার গ্রামের তথা সমগ্র বাংলার মানুষকে এমনি করেই বেঁচে থাকতে হতো।

গঙ্গাপুর দিয়ে অনেক হিন্দু ভারতে যাচ্ছে। একবার মনে করলাম আমিও যাব। কিন্তু রাজাকার আলদর ও খান সেনারা সে পথ রোধ করে আছে। সেখানেও বন্দুকের আওয়াজ। ফিরে আসলাম। যাওয়া হলো না। মনে মনে আমার দাদু চিন্তা করলেন, জন্মিলে মানুষের মৃত্যু হয়, একথা চিরসত্য। সুতরাং মৃত্যুকে ভয় করবো না। এই দেশে জন্মেছি, এদেশেই মৃত্যু। আর পালাবার চেষ্টা করব না।

একদিন মনসার হাটে চাল ও অন্যান্য জিনিস কিনতে যাই। দোকানিরা প্রায়শ দোকান বন্ধ করে থাকে। সে দিন কিছু দোকান খুলছিল, অনেকের মনে ভয় কখন যেন রাজাকাররা আসে। হঠাৎ বাহিরদিয়া রেল স্টেশনে রাজাকারেরা আসে। এই শব্দ শোনার সাথে সাথে দোকানিরা দোকান বন্ধ করা তো দূরের কথা, প্রাণ বাঁচাবার জন্য দৌড়াদৌড়ি এবং হাটুরিয়ারা তাদের ক্রয় করা মাল জিনিস ফেলে ভৈরব নদী পার হয়ে কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করল।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাজাকার এবং খানসেনারা বাজারে প্রবেশ করল। বাজারে লোকদের উদ্দেশ্য করে বলে, তোমরা দৌড়াদৌড়ি হুড়োহুড়ি করো না। আমাদের কথা শোন। রাজাকাররা বললো, এই যে সাহেবরা এসেছে আমাদের মঙ্গলের জন্য। সুতরাং সাহেবের কথা শোন কি বলে। কিছু কিছু লোক রাজাকারদের কথায় আশ্বস্ত হল বটে, কিন্তু ভয়ে কাঁপতে থাকল। আমার দাদুর অনুমান হল, যে আমাদের সান্ত্বনা দিচ্ছে সে হচ্ছে রাজাকারদের কমান্ডার।

কমান্ডার বললো, আপনারা দুই লাইনে দাঁড়ান। এক লাইন হবে হিন্দুদের আর এক লাইন হবে মুসলমানদের। রাজাকাররা ধরে ধরে দাঁড় করাচ্ছে। তবুও মানুষ ছোটাছুটি করছে। রাজাকারদের আয়ত্বে ছিল হিন্দু লাইনটি। হঠাৎ গুলি হল। ১৭ জন হিন্দু নিহত হল। মনসার ব্যবসায়িরা প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। তাদের দোকানে আগুন দেওয়া হল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মনসার প্রতিমা ভেঙ্গে দেয়া হল। আমার দাদু নিজে ওই দিনে হাটে ছিলেন, আর কিভাবে যে প্রাণরক্ষা করেছিলেন তা আমার দাদু স্মরণে নেই।

আমার নিজস্ব এলাকা ছেড়ে দাদু বাগেরহাট এলাকার রজব আলী রাজাকারের ইতিহাস বর্ণনা করছে। তার প্রতিদিনের নিয়ম ছিল মানুষ হত্যা। তার নিযুক্ত করা লোক নিরীহ লোক ধরে তার কাছে দিত। খুব আনন্দ উল্লাসের মধ্যে দিয়ে হত্যাকাণ্ড চালাতো ।

যাই হোক, ঈশ্বর আমাদের অনুকূলে ছিল, যার জন্য আমরা বেঁচে আছি। যেমন রাজাকারেরা যখন গ্রামে প্রবেশ করতো তখন প্রবল বর্ষা এবং মেঘের গর্জন শোনা যেত। ফলে দীর্ঘ সময় রাজাকাররা অপারেশনে থাকতে পারতো না। ঈশ্বরের এই অপূর্ব লীলা কে বুঝতে পারে, এই জন্য মানুষেরা কথায় বলে–

রাখে হরি মারে কে!

সূত্র : জ ১১৮৮৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
চিরঞ্জিত বিশ্বাস	**জয়দেব বাহার**
বাহিরদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রাম: বলটি, পোস্ট: ঘাটভোগ
৮ম শ্রেণি, রোল: ৬৭	থানা: রূপসা, জেলা: খুলনা
	বয়স: ৬০ বছর

রাজাকাররা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল

গল্পটি আমার বাবার কাছ থেকে শোনা। আমার বাবার নাম মো.শহীদুল ইসলাম। আমার দাদাবাড়ি বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ থানার ফাসিয়াতলা গ্রামে। আমার দাদাবাড়ি ছিল নদীর পাশে। আমার বাবা তখন চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। ১৯৭১ সালে তিনি অনেক লাশ নদীতে ভেসে যেতে দেখেছেন। প্রতিদিন রাতে গুলির শব্দে ভয়ে ঘুম হতো না।

একদিনের ঘটনা আমি বাবার কাছ থেকে শুনেছি। বাবা স্কুল থেকে ফিরছিলেন। তখন দেখলেন কয়েকজন রাজাকার হাতে বন্দুক নিয়ে যাচ্ছিল। বাবা তখন ভয়ে একটি গাছের আড়ালে চুপ করে দাঁড়ালেন। তিনি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলেন রাজাকাররা একটি হিন্দু বাড়িতে ঢুকল। একই পরিবারের তিন জনকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। তাদের প্রত্যেকের বয়স ৩০ থেকে ৪০-এর মধ্যে। রাজাকাররা পিছন থেকে লাথি মারতে মারতে হাঁটছিল। তারপরে একটি খালের পাড়ে এসে দাঁড়াল। খালের উপর একটি সাঁকো ছিল। রাজাকাররা ঐ লোকগুলোকে এক একজন করে সাঁকো পার হতে বলল। তারা উঠতে চাচ্ছিল না। তারপর রাজাকাররা তাদের বন্দুকের বাট দিয়ে তাদের পিঠের উপর মারতে লাগল। তখন একজন ভয়ে সাঁকোর উপরে উঠল। মাঝামাঝি যখনই গেল তখনই একজন রাজাকার পিছন থেকে গুলি করল। হিন্দু লোকটি খালের মধ্যে পড়ে গেল। তখন রাজাকাররা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। অন্য হিন্দু লোক দুটি ভয়ে কাঁপতে লাগল। এভাবে একে একে সবাইকে গুলি করা হলো। তাদের রক্তে খালের পানি লাল হয়ে গেল।

এরকম অনেক ঘটনাই বাবা দেখেছেন।

সূত্র : জ-১১৫০৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মুমিত শাওলীন উচ্ছ্বাস	**শহীদুল ইসলাম**
বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: আমলাপাড়া রোড, জেলা: বাগেরহাট
৮ম শ্রেণি	বয়স: ৪৭ বছর, সম্পর্ক: বাবা

কার জায়গায় সৎকার করবে

আমি যখনকার কথা লিখছি তখন আমার বাবার বয়স ৯/১০ বছর। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় এখনকার মতো গাছপালা ছিল না। আমার দাদা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই মির্জাপুর হাসপাতালে গ্যাস্ট্রিক অসুখের জন্য অপারেশন করতে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তখন সবাই বলাবলি করতে লাগল তিনি মারা গেছেন। তিনি একদিন বাড়ি আসার জন্য রওয়ানা হলেন। পথে তাকে পাকিস্তানি বাহিনী আটক করে। আমার দাদার সঙ্গে আরেকটি লোক ছিল। তিনি ছিলেন সাহা। তাদের দুজনকেই পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। তারা দুজনেই অপারেশন করে বাড়ি ফিরছিল। যিনি সাহা তার অপারেশনের ঘা শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার দাদার অপারেশনের ঘা শুকিয়ে ছিল না, তাই আমার দাদাকে ছেড়ে দেয়। আর সাহা বাবুকে মারপিঠ করে ছেড়ে দেয়। তারপর আমার দাদা বাগেরহাট হতে ট্রেনে করে ফকিরহাট এসে পৌঁছায় এবং সেখান হতে নৌকাযোগে বাড়ি এসে পৌঁছায়। আমার দাদা বাড়ি এসে সবাইকে অবাক করে দেয়। তখন বাড়িঘর সবকিছু বন্যার পানিতে তলিয়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধ আরো দানা বাঁধতে শুরু করল। একদিন শোনা গেল যে, আমাদের এলাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করবে। সবাই ছোটাছুটি করতে লাগল। কিন্তু আক্রমণ করল না। আক্রমণ করবে শুনে কয়েকটি পরিবার ভারতে চলে যায়। আমার দাদা ও তার পরিবার নিয়ে নৌকাযোগে শুড়িগাতী যায়। সেখান হতে আমার পিসিমার পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে যায়। নৌকাযোগে নদী দিয়ে যাওয়ার সময় গানবোটে পাকিস্তানি বাহিনী দেখল এবং সবাই আড়ালে আশ্রয় নিলো। গানবোটে করে শত্রুরা চলে গেল। তারপর নদী দিয়ে যেতে যেতে ইটনে নামক গ্রামে গিয়ে পৌঁছায়। তারপর একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তখন কেউ ভারতে যেতে চাইল না, তবে সেখান হতে কয়েকটি পরিবার ভারতে চলে গিয়েছিল। এখন আবারও নৌকায় করে বাড়ি ফিরছিল। তখন ডাবরা নামক একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছায়। তখন একটি বড় মন্দিরে আশ্রয় নেয়। সেদিন রাতে আমার দাদার ডায়রিয়া হয়েছিল। আগে ডায়রিয়া হলে মানুষ বাঁচত না। আমার দাদার বেলায়ও ঠিক তেমনি হয়েছিল। সেখানে থাকাকালীন আমার দাদা দেহত্যাগ করলেন। তখন কার জায়গায় আমার দাদার সৎকার করবে সবাই চিন্তায় পড়লেন। আমার জামাই বলল, তাকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেই। যেই কথা সেই কাজ। তাকে নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হলো। তারপর নৌকাযোগে বাড়ি ফিরে আসল এবং সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ল। কয়েকদিন পর পাকিস্তানি বাহিনী একটি লোককে গুলি করে হত্যা করে এবং সবাই তাকে দেখতে পায়।

আমার বাবাও যায়। এই হত্যার কথা আমার বাবা কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

সূত্র : জ-১০৯৯৩

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সীমা হালদার	**দুলাল হালদার**
চাঁদেরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বয়স: ৪৭
৮ম শ্রেণি, রোল: ১০	সম্পর্ক: বাবা
মোল্লারহাট, বাগেরহাট	

গোসল করে আসতে বলে

আমার জামাই, নাম সফি মেদ্দা, আর তার ছেলের নাম সাহা মেদ্দা। তারা মুক্তিবাহিনীর দলে থাকে। তাই সফি মেদ্দাকে মারার জন্য পাকিস্তানিরা তার খোঁজ নেয়। সফি মেদ্দার বাড়ি ছিল কাকারবিল। সেদিন সফি মেদ্দা গোয়ালমাঠ বাজারে বাজার করতে আসছিল। তাই পাকিস্তানিরা খোঁজ পেয়ে সফি মেদ্দাকে মারার জন্য বাজারে আসে। কিন্তু তখন সফি মেদ্দা বাজার শেষে বাড়িতে যায়। এরপর সফি মেদ্দার ছেলের জন্য একটি জিনিস

কিনবে বলে সে জন্য তার ছেলেকে নিয়ে আবার আসে। তখন বাজারে না আসলে সে গুলিবিদ্ধ হত না। বাজারে আসার সাথে সাথে সফি মেদ্দা ও তার ছেলে সাহা মেদ্দাকে বাজারের মধ্যে পাকিস্তানিরা মারধর করে। এরপর সাহা মেদ্দা ও তার ছেলের চোখ বেঁধে গোয়ালমাঠ বাজার থেকে ভ্যানে তুলে নিয়ে যায়। তারপর ফতেপুর ব্রিজের কাছে গিয়ে পাকিস্তানিরা সফি মেদ্দা ও তার ছেলেকে লাথি মেরে ভ্যান থেকে নামায়। নামানোর পর সফি মেদ্দা পাকিস্তানিদের অনুরোধ করে বলে তাকে আগে মারতে, পরে তার ছেলেকে মারতে। সফি মেদ্দার ছেলেকেও রেহাই দেয়নি। এরপর সফি মেদ্দা ও তার ছেলেকে ফতেপুরের খাল থেকে গোসল করে আসতে বলে। সফি মেদ্দা ও তার ছেলে খাল থেকে ডুব দিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সফি মেদ্দার ছেলেকে প্রথমে গুলি করে সবার সামনে হত্যা করে। পরে সফি মেদ্দাকে গুলি করে। সবাই দেখে ভয়ে দৌড়াতে থাকে। এভাবে পাকিস্তানিরা মানুষদের উপর অত্যাচার করে।

সূত্র : জ ১০৮৩০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
শেখ আল মামুন	**জোলেখা বেগম**
গোয়ালমাঠ রসিকলাল মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রাম: রাড়িপাড়া, পোস্ট: শোলারকোলা
৭ম শ্রেণি, রোল: ৪	থানা: কচুয়া, জেলা: বাগেরহাট
কচুয়া, বাগেরহাট	বয়স: ৬৫ বছর, সম্পর্ক: চাচী

সুন্দরের কোন মূল্য নেই

১৯৭১ সালের একটি ঘটনা। আমার ঠাকুরমার বয়স তখন ৪০ বছর। এটি তার পরিবারেরই একটি ঘটনা। ১৯৭১ সাল যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন তার পরিবারকে রক্ষা করার জন্য, আশ্রয়ের জন্য পাশের একটি গ্রামে পাঠিয়ে দিল। তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই তার গ্রামের উপর আক্রমণ করলো পাকিস্তানিরা। গ্রামের প্রতিটি ঘরই তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল এবং তাদের সব কিছু কেড়ে নিল রাজাকাররা। তখন আমার ঠাকুরমা এসব অত্যাচার দেখে আর সহ্য করতে না পেরে তার পরিবারকে নিয়ে আমাদের প্রতিবেশি দেশ ভারতে যাবার জন্য তৈরি হলো। তারা ভারতে যাবে বলে আমার বড় জেঠাকে পাঠাল তার পুত্রবধুকে আনার জন্য। জেঠা যখন পথে বের হলো তখন পাকিস্তানিরা তাকে ধরে নিয়ে গেল। তার উপর অত্যাচার করতে শুরু করলো। কিন্তু তাকে তারা গুলি করল না। অনেক অনুরোধ করার পর তাকে ছেড়ে দিল। আমার ঠাকুরমা দিশেহারা হয়ে আর কোন উপায় না পেয়ে ভারতের দিকে রওয়ানা হলো। কিছুক্ষণ পর আমার ঠাকুরমা দেখল আমার জেঠা একা এবং তার শরীর রক্তে ভরা। ঠাকুরমা তাকে দেখে অনেক কান্নাকাটি করল।

নৌকাটা একটি ধানের ক্ষেতের ভিতর রাখল তখন ছিল গভীর রাত। কারো মুখে কোন কথা নেই। শুধু জলের শব্দ। তারা যখন নৌকায় উঠল তখন পাকিস্তানি বাহিনী তাদের বড় বড় নৌকা নিয়ে তাদের আক্রমণ করল। সবাই দৌড়ে পালাল। কেউ কেউ পালাতে পারল না। তারা তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য কচুড়িপানার ভিতর লুকিয়ে থাকলো। কিছুক্ষণ পর তারা কাউকে না পেয়ে চলে গেল। তখন তারা তাদের যেতে দেখে আবার নৌকায় উঠল। অনেক দূর যাবার পর তারা ভাবল এখানে বুঝি পাকিস্তানিরা নেই। সেখানে ছিল আমার ঠাকুরমার বাবার বাড়ি। সেখানে ঠাকুরমা দুজনকে পাঠাল কিছু খাবার আনার জন্য । কিন্তু তারা পথে দেখল শুধু মৃত দেহ– রক্তে যে নদী বয়ে যাচ্ছে। এসব দেখে তারা আর সামনের দিক এগোলো না। তারা পাশে ফিরে দেখল পাকিস্তানিরা আসছে। তাই দেখে তারা দৌড়ে পালাল। তারা নৌকায় উঠে আবার রওয়ানা হল। কিছুক্ষণ পর তারা ভারতে পৌঁছালো। সেখানে দেখল তাদের মত নিঃস্ব অনেকেই এসেছে। তারা সেখানে গিয়ে কিছু খাবার তৈরির জন্য সব

কিছু গোছাতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ করে আকাশ থেকে অঝোরধারে বৃষ্টি নামল। তখন তারা একটি ঘরে আশ্রয় নিল। বৃষ্টি থামার পর বাইরে এসে দেখল একটি গর্ভবতী মহিলা। বৃষ্টিতে ভিজে আর হাঁটতে পারছে না। তার সাথে ছিল একটি বৃদ্ধ মহিলা। কিছু দূর যাবার পর মহিলাটি একটি সুন্দর বাচ্চা জন্ম দিলো। কিন্তু তখন সুন্দরের কোন মূল্য নেই। বাচ্চাটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদতে লাগল। কিন্তু তার মা তাকে কিছুই দিতে পারল না।

সূত্র : জ-১১১৮৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
শুক্তা বিশ্বাস	**সুশীলা দেবী**
শহীদ হেমায়েত উদ্দিন বালিকা বিদ্যালয়	গ্রাম: গিরিশনগর
৯ম শ্রেণি, ব্যবসায় শিক্ষা, রোল: ০৪	থানা: মোল্লারহাট, জেলা: বাগেরহাট
	বয়স: ৭৭ বছর, সম্পর্ক: ঠাকুর মা

সবচেয়ে বড় যুদ্ধ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত বারোটার পরে পাকিস্তানি বাহিনী এদেশের সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। সেই রাতের অন্ধকারে এদেশের বাঙালিদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা শুরু করেছিল। স্বাধীনতার জন্য বাংলার দামাল ছেলে, ইপিআর, পুলিশ বাহিনীর লোকেরা পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তখন থেকে বাংলার সাধারণ মানুষ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে বাংলাদেশে ফিরে এসে যার যার এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের জন্য ক্যাম্প গড়ে তুলেছিল। সেভাবে বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার চরকুলিয়া বাজারে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ক্যাম্প গড়ে ওঠে। মোল্লাহাট সদরে ছিল পাকহানাদার বাহিনীর ক্যাম্প। মোল্লাহাট সদর হতে চরকুলিয়া বাজার প্রায় ৬ কি.মি. দূরে অবস্থিত। একদিন হঠাৎ আনুমানিক দশটায় চরকুলিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে পাক হানাদার বাহিনী আক্রমণ চালিয়েছিল। তখন মুক্তিযোদ্ধারা পাক হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু করেছিলো। ঐ দিন শুক্রবার ছিল। তারপর পাক হানাদার বাহিনীর ক্যাপ্টেন সেলিম গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণের মুখে পাকহানাদার বাহিনী পিছু হটে মোল্লাহাট সদরে তাদের ক্যাম্পে ফিরে এসেছিল। ঐ যুদ্ধই ছিল বাগেরহাট জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ, যার খবর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়েছিল।

এ যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একজন নিহত হয়েছিলেন। যার স্মরণে মোল্লাহাট উপজেলায় একটি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে "শহীদ হেমায়েত উদ্দিন উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়"। আমি সে স্কুলেরই একজন ছাত্রী। এ বিদ্যালয়ে পড়তে পেরে নিজেকে আমি ধন্য মনে করি। তাছাড়া এ বিদ্যালয় দেখে মোল্লাহাটবাসীর গর্ব জাগে। এছাড়াও আমি মনে করি আমাদের গ্রামে এমন দেশপ্রেমিক সন্তান ছিল যে, দেশের জন্য নিজের জীবন হাসিমুখে উৎসর্গ করতে পারেন। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন এরকম দেশপ্রেমিক সন্তান বাংলার ঘরে ঘরে হাজার হাজার জন্ম নেয়।

সূত্র : জ-১১২১০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
রুকাইয়া আফছারী লিপ্তা	**মোস্তফা গাউসুল হক**
শহীদ হেমায়েত উদ্দিন বালিকা বিদ্যালয়	গ্রাম: গাড়ফা, থানা: মোল্লাহাট,
৭ম শ্রেণি, রোল: ৮	জেলা: বাগেরহাট

বয়স: ৫৬ বছর, সম্পর্ক: বাবা

বাগেরহাটে সেদিন উড়ে নাই

আমার দাদা একজন মুক্তিযোদ্ধা। গেরিলা ট্রেনিংপ্রাপ্ত। আমার দাদার নাম আব্দুল হাকিম সরদার। পিতা মৃত: ছায়েম উদ্দিন সরদার, গ্রাম: দত্তকার্থী, থানা+জেলা-বাগেরহাট। মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট গেজেট নং ১৬৩, ক্রমিক নং-৩১৯, বর্তমান বয়স ৬৬ বছর ১০ মাস।

আমি যখনই একটু সময় পেতাম তখনই দাদার কাছ থেকে জানতে চাইতাম ১৯৭১ সালের ইতিহাস। কীভাবে কোথায় কোন অবস্থায় পাকবাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয়েছিল মুক্তিবাহিনীর। আমার দাদা আমাকে '৭১ এর ইতিহাস বলতেন। সেগুলো আমি প্রকাশ করলাম। আমার দাদা দরিদ্রতার নিচ সীমানায় বাস করতেন। অর্থ প্রতিপত্তি কিছুই নেই, ন্যায়নীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে। যাই হোক পাকিস্তান আমলে আমার দাদা একজন আনসার বাহিনীর সদস্য ছিলেন। ১৯৭১ সালে যখন পাকহানাদার বাহিনী বাঙালিদের উপর বর্বর নির্যাতন শুরু করলো। তখন তা কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না আমার দাদা এবং তার সহকর্মীরা। ঝাঁপিয়ে পড়লেন খুলনা গল্লামারী নামক স্থানে। শুরু হলো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন সুবেদার তাজুল ইসলাম। সেখানেই আমার দাদার প্রথম যুদ্ধ। পরবর্তীতে যোগ দিলেন পাকিস্তান আমলের মিলিটারি মেজর মো. আবজাল হোসেন। তখনই গঠিত হয় মুক্তিযোদ্ধা দল এবং দলের কমান্ডার উপাধি পেলেন সুবেদার তাজুল ইসলাম। শুরু হয় পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ। সেটি ছিল বাগেরহাট সদর থানাধীন একটি গ্রামে। তুমুল যুদ্ধের বিনিময়ে হটিয়ে দিলেন পাক বাহিনীদের এবং নিয়ে নিলেন পাক বাহিনীর হ্যাভি মেশিনগান, উদ্ধার করলেন অনেক গোলাবারুদ ও অস্ত্র। এর কিছুদিন পরে আবার শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। স্থানটি ছিল বাগেরহাট জেলাধীন কচুয়া থানার মাধবকাঠি গ্রামে। দুঃখের বিষয় গোলাবরুদ না থাকার কারণে পরাজয় স্বীকার করতে হলো আমার দাদা এবং সহকর্মীদের। তখন ক্ষিপ্ত হয়ে আমার দাদার নেতৃত্বে তারা ভারত সিংভূম জেলায় চাকুলিয়া ক্যান্টনমেন্টে হাজির হয়। সেখান থেকে এক মাস গেরিলা ট্রেনিং নেয়। পরে ওখান থেকে ভারতের সহযোগিতায় চলে আসে বর্ডারের বেগুনদিয়া ক্যাম্পে।

ওখানে আমার দাদাসহ ৪১ জনকে রেখে সুবেদার তাজুল ইসলাম চলে আসে বাংলাদেশে। ঠিক তখনই মেজর জলিলের নেতৃত্বে আমার দাদা আ. হাকিম সরদার বাংলাদেশে এসে ৯নং সেক্টরে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিছুদিন পরে ক্যাপ্টেন জিয়া শরণখোলা থানাধীন রায়েন্দা বাজারে তার সদস্য নিয়ে হানাদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়। কিন্তু পরাজয় স্বীকার করলেন মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা। অবশেষে ক্যাপ্টেন জিয়া, মেজর জলিলের কাছ থেকে আমার দাদা আ. হাকিম সরদারসহ মোট ৪১ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে নিলেন। ক্যাপ্টেন জিয়া এবং মেজর জলিল ঘোষণা দিলেন ৪১ জন মুক্তিযোদ্ধার কমান্ডার হবে আমার দাদা হাকিম সরদার ওরফে রাজু মিয়া। আর দেরি নয় বলে আমার দাদা ৪১ জন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রায়েন্দা বাজারে হানাদার ও রাজাকার-এর উপরে। শুরু হয় জীবন-মরণ যুদ্ধ। পরাজিত হয় হানাদার বাহিনী। পালিয়ে যায় তারা। পালিয়ে বাগেরহাট আশ্রয় নেয়। ওই দিন ছিল ১৫ ডিসেম্বর। সেদিন রাতে আমার দাদাভাই তার মুক্তিবাহিনী নিয়ে চলে আসে বাগেরহাট। সারাদেশে জয়ের পতাকা উড়ে। কিন্তু বাগেরহাটে সেদিন উড়ে নাই জয়ের পতাকা। বাগেরহাট দখলে ছিল রাজাকার প্রধান কুখ্যাত রজ্জব আলী ফকির ও তার দলবলের। টের পেয়ে আমার দাদা ও তার বাহিনী এবং সব মুক্তিবাহিনী এক হয়ে আঘাত হানে রাজাকার বাহিনীর উপর। সেদিন ১৭ ডিসেম্বর মারা যায় বহু মানুষ। রাজাকার বাহিনী পালিয়ে যায়।

সূত্র : জ-১০৯৪১

সংগ্রহকারী
তানিয়া আক্তার ময়না
গোয়ালমাঠ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়
৬ষ্ঠ শ্রেণি, খ শাখা, রোল: ১১৯
কচুয়া, বাগেরহাট

বর্ণনাকারী
আ. হাকিম সরদার
গ্রাম: দওকাঠী, থানা+জেলা: বাগেরহাট
বয়স: ৬৬ বছর

নীরবে চোখের জল ফেলেন

বলেশ্বর নদীর তীরবর্তী একটি ছোট গ্রাম ভাষা। এ গ্রামেরই ঐতিহ্যবাহী ছিটাবাড়ি। আমার দাদু ছিলেন ডাক্তার। তাই অনেকে এটিকে ডাক্তার বাড়ি বলত। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যেসব বাড়ি হারিয়েছে সন্তানদের, হারিয়েছে জীবন, এ বাড়ি সে তালিকারই অন্তর্ভুক্ত। ২৫ জুন ১৯৭১। দুপুর বেলা বাজার থেকে ফিরে এসে আমার দাদু বললেন গ্রামে মিলিটারি এসেছে। ওই দিন বিকেল বেলা প্রায় চারটার সময় মিলিটারিরা তাদের অত্যাচার শুরু করল। অন্যান্য বাড়ি থেকে লোকজন ধরে এনে নদীর তীরে রাখা হলো। এরপর মিলিটারিরা মামাদের বাড়িতে এল। আমার দাদু ও তার ছোট ভাই প্রায়ই বাড়ি থাকতেন না। বাসুদেব মামা থাকতেন তার হোস্টেলে। ঐদিন বিকেলে তিনি বাড়ি আসেন। আমার ছোট দাদুও ঐদিন বাড়ি এলেন। খুব আনন্দের সাথে রাতের খাবারের আয়োজন করছিলেন দাদু। একমাত্র ছেলে অনেকদিন পর বাড়ি এসেছে। বাসুদের মামা সবে মাত্র খেতে বসেছেন। মিলিটারি আসতে দেখে দাদু চিৎকার করে উঠলেন। যার যেদিক ইচ্ছে পালাল। কিন্তু বাসুদেব মামা ঘরের পিছন দিকে দৌড়ানোর সময় একজন রাজাকার তাকে দেখে ফেলে। ফলে তাকে ধরে নিয়ে যায় নদীর তীরে। ছেলেকে নিয়ে যেতে দেখেছেন দাদু। নদীর অপর তীরে ধান ক্ষেতের ভিতর থেকে তিনি দেখতে পেলেন সবাইকে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে তারপর গুলি চালাল। একে একে লাশ পড়তে লাগল নদীতে। মিলিটারিরা চলে যাওয়ার পর দাদু এসে দেখলেন দুটি বুলেট বাসুদেব মামার পাকস্থলি ভেদ করে চলে গেছে। ভাত বেরিয়ে এসেছে বাইরে। অনেক কষ্ট করে মামার লাশ দাদু বাড়ি আনলেন। অত্যন্ত চুপিসারে দাফন করা হলো মামাকে। বাসুদেব মামার মা ও বাবা ভীষণ কান্না জুড়ে দিল। এখনও বাসুদেব মামার মা নীরবে চোখের জল ফেলেন।

সূত্র : জ-১০৯৫৯

সংগ্রহকারী
মানসী মলঙ্গী
গোয়ালমাঠ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়
৯ম শ্রেণি, বিজ্ঞান শাখা, রোল: ১
কচুয়া, বাগেরহাট

বর্ণনাকারী
সমীর কৃষ্ণ পাইক
গ্রাম: ধোপাখালী ভাষা,
বয়স: ৬৩ বছর, সম্পর্ক: বড় মামা

পাঁচ ছটি দা কেন ধার দিচ্ছে

হঠাৎ একদিন যুদ্ধের কথা শুনে আমার নানা নানি খুব চিন্তিত। সেদিন ছিল শুক্রবার। বিকেলে আমার নানা-নানিসহ গ্রামের আর যারা ছিল তারা খবর পেল যে, খানেরা গানবোট ভরে গোলা-বারুদ নিয়ে মোংলায় এসেছে এবং তারা আরও জানতে পারলেন যে, গোলাগুলি হবে। তখন আমার নানা নানিসহ আরও লোকজন আত্মরক্ষার জন্য মাটি খুড়ে গর্ত করে।

শনিবার সকালে আমার নানা-নানি দু'টি গুলির আওয়াজ শুনতে পেল। দুদিন পর পিস কমিটির চেয়ারম্যান নানা-নানিসহ গ্রামের অন্যান্য যারা আছে তাদের খবর দিল যে, তিন মাইলের বাইরে তোমরা সবাই চলে যাও, কারণ বৃষ্টির ধারায় গুলি ছোড়া হবে। এই কথা শুনে আমার নানা-নানিসহ গ্রামের সবাই গ্রাম ছেড়ে রওয়ানা দিলো আত্মরক্ষার জন্য পূর্ব অঞ্চলে। তারা যেতে যেতে অনেক দূর চলে গেল। সামনে বড় বিলের ভিতরে একটা বড় বাড়ি দেখতে পেল তারা। আমার নানা-নানির সাথে গ্রামের আরও প্রতিবেশি ছিল, তা প্রায় ১০০ জনেরও বেশি । কিন্তু ঐ বাড়িতে যেতে যেতে সকাল হয়ে গেল। ঐ বাড়ির লোকেরা খুব যত্ন করল। আমার নানা-নানি ও আরও প্রতিবেশিদের জন্য তারা রান্না করতে লাগল এবং দুপুর হয়ে এলো। এ সময় তাদের মধ্যে থেকে একজন মহিলা বাথরুমে গেল। সে ডানপাশে তাকিয়ে দেখতে পেল যে পাঁচটি দা ধার দিচ্ছে একটা লোক। তখন মহিলাটির মনে সন্দেহ হলো যে পাঁচ ছটি দা কেন ধার দিচ্ছে? সে মহিলা বাথরুম থেকে বের হয়ে আমার নানা-নানিসহ যারা ছিল তাদের কথাটি জানিয়ে দিল। তখন সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল যে কি করা যায়। আমার নানি কাজের মহিলার কাছে জানতে চাইলেন যে, এ বাড়ির লোকগুলি কি রকম বা কি চরিত্রের। তখন কাজের মহিলা বললেন যে, আমি তা বলতে পারব না। তখন আমার নানি বললেন, কেন বলতে পারবে না? তখন সে মহিলা বললেন যে, ওরা জানতে পারলে আমাকে বাঁচতে দেবে না। তখন আমার নানি বললেন, না, তুমি বলো। তোমার কোন ভয় নেই আমি বলবো না। তখন সে মহিলা বললেন যে, আমি এখানে পেটের দায়ে থাকি। এরা ছয় ভাই ডাকাত। এরাতো সন্ধ্যার পরে তোমাদের কাছে যা কিছু আছে সবকিছু নিয়ে যাবে। প্রয়োজনে তোমাদের হত্যা করতে পারে।

এই খবর শুনে আমার নানিসহ সবাই সেখান থেকে পালাবার জন্য কেউ গোসল করার কথা বলে কেউ হয়তো কিছু কেনার কথা ইত্যাদি বলে সেখান থেকে পালাবার চেষ্টা করে। কেউ তারকাঁটা থেকে লাফিয়ে বের হল, আর মহিলারা তারকাঁটা ফাঁক করে বেরিয়ে গেল। দাদির পরনের কাপড়, গায়ের চামড়া ইত্যাদি তারকাঁটায় বেঁধে রয়ে গেল। তারপর সবাই দৌড়াতে লাগল এবং যে ছ'জন ডাকাত ছিল তারা ছিল ঘরের পেছনে। তারা কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারল যে, যারা আশ্রয় নিয়েছিল সবাই চলে যাচ্ছে। তখন ডাকাতরা দা নিয়ে দৌড় দিল। কিন্তু তাদের ধরতে পারল না। তারা একটা গ্রামে উঠে যে যার মতো ছড়িয়ে গেল।

আমার নানা-নানি কিছু দিন একটা বাড়িতে থাকল। তারপর তারা বাড়ি রওয়ানা দিল। পথে দুটি লোক আমার নানা-নানির পথ আটকে ধরলো। বললো যে, কি আছে তোমাদের কাছে, সব বের করো। তখন আমার নানা-নানি বলল, দেখ আমাদের কিছু নাই, আমরা খুবই গরিব, আমরা আত্মরক্ষার জন্য এখানে এসেছি। তখন সে দুটি লোক আমার নানা নানিকে ছেড়ে দিল। তারপর আমার নানা নানি বাড়ি ফিরে জানতে পারল যে, খৃষ্টানদের কোন ভয় নেই। তখন তারা তাদের মতো জীবন যাপন করতে লাগল।

হঠাৎ একদিন পিস কমিটির চেয়ারম্যান প্রতি বাড়ি এসে জানিয়ে দিল যে, আগামীকাল সকাল বেলায় পুরুষরা সবাই এক নম্বর জেটিতে যাবে, সেখানে খানেরা মিটিং করবে। সেদিন সকাল দশটায় প্লেন চলে আসল। যখন সেই প্লেন গুলি করে তখন আমার নানা নানি গর্তের ভিতর লুকিয়ে থাকে। নাসির বিহারি নামে একটা লোক মাঝে মাঝে তাদের গ্রামে আসত। একদিন নাসির আমার নানা নানির বাড়িতে ঢুকে বললো আমার নানাকে যে, তোর জাল আছে? তখন আমার নানা বলল যে আছে। তখন সে বললো, জাল বের কর। তখন আমার নানা জল বের করে। নাসির বিহারি বলল যে আমার সাথে আয়। তখন আমার নানা ওদের সাথে গেল এক হিন্দু বাড়িতে। তখন সে বাড়িতে একটি পুকুর ছিল এবং সে পুকুরে ছিল পাঙ্গাস ও রুই মাছ। তখন আমার নানাকে মাছ ধরতে বললো এবং আমার নানা মাছ ধরল। আমার নানাকে পাঁচটি পাঙ্গাস মাছ দিলো এবং আমার নানাকে বাড়িতে যেতে বললো। তখন আমার নানা বাড়ি গেল। আর নাসির বিহারি আর তার সাথে যারা ছিল তারা মাছ নিয়ে গেল।

খানেরা কিছুদিন পর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হলো।

সূত্র :জ-১১৬২৬

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মারচেল্লো জয় সরকার	**মনিকা বিশ্বাস**
সেন্ট পলস্ উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: মালগাজী, পোস্ট: হলদিবুনিয়া
৬ষ্ঠ শ্রেণি, কমলা শাখা, রোল: ৬৪৭৩	বয়স: ৬২ বছর, সম্পর্ক: দাদি
মোংলা, বাগেরহাট	